ল্যাবএইড
PATIENT SAFETY & QUALITY OF CARE
NABH INTERNATIONAL ACCREDITED
এনএবিএইচ স্বীকৃত দেশের একমাত্র হাসপাতাল

সুখেঅসুখে

স্বাস্থ্যবিষয়ক প্রকাশনা

বর্ষ ১৪, সংখ্যা ৪৫, জুলাই ২০২৪

কন্যাশিশু কিশোরী ও মায়ের সুরক্ষা

ল্যাবএইড ইমার্জেন্সি ও অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস

শুধুমাত্র সময়মত সঠিক চিকিৎসাই শতকরা ৯৫ ভাগ মারাত্মক অসুস্থ রোগীকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারে। তাই হঠাৎ অসুস্থতায় বা দূর্ঘটনায় ঝুঁকি না নিয়ে রোগীকে সরাসরি নিয়ে আসুন আমাদের হাসপাতালে অথবা ফোন করুন অ্যাম্বুলেন্সের জন্য। আমাদের ভ্রাম্যমান আইসিইউ ও সিসিইউ সম্বলিত অ্যাম্বুলেন্স রোগীর কাছে পৌঁছানো মানে তখন থেকেই রোগীর পরিপূর্ণ চিকিৎসা শুরু। ল্যাবএইড জরুরি বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, দক্ষ নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীরা সব ধরণের জরুরি চিকিৎসাসেবা দিতে প্রস্তুত ২৪ ঘন্টা।

২৪ ঘণ্টা জরুরি চিকিৎসা বিভাগ

....ভ্রাম্যমান হাসপাতাল যখন আপনার দরজায়

যেসব কারণে জরুরি চিকিৎসা প্রয়োজন:

- বুকে ব্যথা / শ্বাসকষ্ট / স্ট্রোক
- মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়া / অজ্ঞান হয়ে যাওয়া / খিঁচুনি হওয়া
- যে কোনো এক্সিডেন্ট যেমন, হেড ইনজুরি, হাড় ভাঙ্গা ইত্যাদি
- পুড়ে যাওয়া
- প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়া
- জরুরি ডেলিভারি
- অ্যাজমা রোগীদের হঠাৎ শ্বাসকষ্ট শুরু হওয়া
- চোখে, কানে, নাকে, গলায় কিছু আটকে গেলে
- কিডনি রোগীর ২৪ ঘন্টা ডায়ালাইসিস
- শিশুদের জরুরি চিকিৎসা

২৪ ঘন্টা ইমার্জেন্সি সার্ভিস : ০১৭ ১৩৩৩ ৩৩৩৭
২৪ ঘন্টা কাস্টমার সার্ভিস : ০১৭ ৬৬৬৬ ২১১১

LABAID

ল্যাবএইড হাসপাতাল

বাড়ি ১, রোড ৪, ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৫, ফোন : ৯৬৭৬৩৫৬, ৫৮৬১০৭৯৩-৮
ওয়েব : www.labaidgroup.com, ই-মেইল : info@labaidgroup.com

সুখে অসুখে

কন্যাশিশু কিশোরী ও মায়ের সুরক্ষা

কন্যাশিশু যখন বয়ঃসন্ধিকালে পৌঁছায়, তখন তার শারীরিক ও মনোজগতে বিশেষ পরিবর্তন আসে। গর্ভধারণের সময়েও নারী এক বিস্ময়কর পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। এ ছাড়া মেনোপজ-পরবর্তীকালে ব্যাপক প্রভাব পড়ে নারীর মন ও শরীরে। কন্যাশিশু থেকে কিশোরী, এরপর মা হয়ে ওঠা—এই দীর্ঘ পথপরিক্রমায় বয়সভেদে নারী নানা ধরনের রোগব্যাধির সম্মুখীন হতে পারেন।

গর্ভকালীন ভ্রূণের ত্রুটির ফলে টার্নার সিনড্রোম নিয়ে জন্মাতে পারে কন্যাশিশু। আবার জন্মের পরপরই নবজাতক আক্রান্ত হতে পারে জন্ডিস ও ডায়াবেটিসে। অনেক কিশোরীর ঠিক সময়ে বয়ঃসন্ধি আসে না, আবার কারো ক্ষেত্রে দেখা দিতে পারে পিরিয়ডজনিত নানা জটিলতা। গর্ভবতী নারীও নানা জটিলতার মুখোমুখি হতে পারেন। আমাদের দেশে জরায়ুমুখ ক্যানসার কিংবা ওভারিয়ান সিস্টে আক্রান্ত নারীর সংখ্যাও আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে।

এবারের সুখে অসুখে ম্যাগাজিনের শিরোনাম ‘কন্যাশিশু, কিশোরী ও মায়ের সুরক্ষা’। শিশু, কিশোরী ও মা—এভাবে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। সমস্যা ও প্রতিকার নিয়ে লিখেছেন দেশের শীর্ষস্থানীয় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ।

আশা করি, সুখে অসুখের এ সংখ্যাটি আপনাদের উপকারে আসবে।

সম্পাদক
ডা. এ এম শামীম

বাড়ি ১, রোড ৪, ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৫, **ফোন :** ৫৮৬১০৭৯৩-৮, **ফ্যাক্স :** ৮৮-০২-৯৬১৫৪৯৭
ই-মেইল : info@labaidgroup.com, **ওয়েব :** www.shukheoshukhe.com

10606

LABAID LASER and AESTHETIC LOUNGE

আপনার ত্বকের পরিপূর্ণ চিকিৎসায়

ল্যাবএইড লেজার অ্যান্ড এস্থেটিক লাউঞ্জ

এখন নতুন পরিসরে

আপনি কি ত্বকের সমস্যা ও উজ্জ্বলতা নিয়ে ভাবছেন?

ল্যাবএইড লেজার অ্যান্ড এস্থেটিক লাউঞ্জে রয়েছে বিশেষজ্ঞ ডার্মাটোলজিস্ট ও সর্বাধুনিক প্রযুক্তি যার সমন্বয়ে ত্বকের পরিপূর্ণ চিকিৎসা, উজ্জ্বলতা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা যায় খুব সহজেই।

চিকিৎসাসেবাসমূহ:

- যেকোনো ধরনের তিল বা আঁচিল অপসারণ
- অবাঞ্ছিত লোম বা চুল অপসারণ
- ব্রণ, ব্রণের গর্ত, ব্রণের দাগের চিকিৎসা
- মেছতা / জন্ম দাগ / ট্যাটু অপসারণ
- বয়সের ছাপ দূরীকরণ এবং ত্বক টানটান করা
- ত্বকের ভাইরাল সংক্রমণ ও ত্বকের ক্ষত দূর করা
- বলিরেখা, মুখে দাগ, স্কিন ট্যাগ দূর করা
- ত্বক ফর্সা করা
- চোখের চারপাশের কালো দাগ দূরীকরণ
- খুশকি, চুল পড়া বন্ধ করা ও চুল গজানোর চিকিৎসা
- তারুণ্যদীপ্ত ত্বকের জন্য বিশেষ লেজার চিকিৎসা
- চুল পড়ে যাওয়া / টাক সমস্যা
- নখের ছত্রাক বা নেইল ফাঙ্গাস

ল্যাবএইড লেজার অ্যান্ড এস্থেটিক লাউঞ্জ
ল্যাবএইড আইকনিক, বাড়ি ৬৬, কলাবাগান
ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৫, ওয়েব: www.labaidgroup.com

- বিস্তারিত জানতে: **017 6666 1673**

সূচিপত্র

বর্ষ ১৪, সংখ্যা ৪৫, জুলাই ২০২৪

শিশু

- টার্নার সিনড্রোম : কন্যাশিশুর কম উচ্চতা ০৭
- অটিজম : শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশজনিত সমস্যা ০৯
- শিশুদের ডায়াবেটিস ও প্রতিরোধে করণীয় ১১
- নবজাতকের জন্ডিস ও প্রতিকার ১৪
- বিভিন্ন বয়সে নারীদের পুষ্টি ১৬

কিশোরী

- শিশু-কিশোরের ঘুমের সমস্যা ১৮
- অনিয়মিত পিরিয়ডের কারণ, জটিলতা ও চিকিৎসা ২০
- হরমোন সমস্যা : বিলম্বিত বয়ঃসন্ধি ২৩
- মেয়েদের অবাঞ্ছিত লোম : অপসারণে লেজার ট্রিটমেন্ট ২৫
- কিশোরীদের যত টিকা ২৭

নারী

- গর্ভকালীন স্বাস্থ্যযত্ন : সুরক্ষায় করণীয় ৩০
- ওভারিয়ান সিস্ট : লক্ষণ, ধরন ও চিকিৎসা ৩৩
- হাড়ের রোগ অস্টিওপোরোসিস : প্রতিরোধে করণীয় ৩৫
- নারীর মেনোপজ : কী ধরনের প্রভাব ফেলে মন ও শরীরে ৩৮
- নীরব ঘাতক জরায়ুমুখের ক্যানসার ৪১
- বাড়ছে স্তন ক্যানসারের ঝুঁকি ৪৩
- স্তন ক্যানসার শনাক্তে স্ক্রিনিংয়ের গুরুত্ব ৪৫

সুখে ও অসুখে

10606

LABAID

আপনি জানেন কি?

‘ভিটামিন ডি’ স্বল্পতা যেকোনো রোগের কারণ হতে পারে!

ভিটামিন ডি-টেস্টের মাধ্যমে

জেনে নিন আপনার ভিটামিন ডি এর মাত্রা

- **বিভিন্ন ধরনের ব্যথা**
- **মানসিক অবসাদ**
- **শারীরিক দুর্বলতা**
- **হাড় ও হাড় ক্ষয়জনিত সমস্যা**
- **চুল পড়ে যাওয়া ইত্যাদি**

এগুলো হতে পারে ভিটামিন ডি-এর ঘাটতির কারণে। এছাড়াও নিচের লক্ষণগুলোও দেখা যেতে পারে।

‘ভিটামিন ডি’ ঘাটতির লক্ষণসমূহ:

বয়স্কদের ক্ষেত্রে:

- সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গেলে অথবা কিছুক্ষণ হাঁটলে হাঁটু অথবা পায়ের যেকোনো অংশে ব্যথা হওয়া
- সারা শরীরে ব্যথা, কোমরে ব্যথা, মাংসপেশিতে ব্যথা
- হাড় ক্ষয়জনিত ব্যথা এবং নানা উপসর্গ
- মানসিক অবসাদ, বিষন্নতা অথবা যেকোনো মানসিক পরিবর্তন
- ঘনঘন সংক্রমণ ও কোনো ক্ষত সহজে না সারা
- শারীরিক দুর্বলতা ও দ্রুত ক্লান্ত হয়ে যাওয়া
- চুল পড়ে যাওয়া
- হৃদরোগ, ডায়াবেটিসসহ বিভিন্ন ধরনের রোগ হতে পারে
- বিভিন্ন ধরনের চর্মরোগ হতে পারে

শিশুদের ক্ষেত্রে:

- রিকেটস রোগ-এর কারণে হাড় নরম হয়ে বেঁকে যেতে পারে
- রক্তে ক্যালসিয়াম কমে গিয়ে অচেতন হয়ে যেতে পারে

ভিটামিন ডি-এর মাত্রা না জেনে কোনো ধরনের সাপ্লিমেন্ট নিলে যেকোনো ধরনের জটিলতা হতে পারে। তাই ভিটামিন ডি-এর সঠিক মাত্রা জানুন, সুস্থ থাকুন।

‘ভিটামিন ডি’ ঘাটতির ঝুঁকি কাদের বেশি:

- শিশু (০-১৬ বছর)
- মহিলা (যেকোনো বয়সের হতে পারে)
- গর্ভবতী মহিলা
- পুরুষ (যাদের বয়স সাধারণত ৪০ অথবা তার বেশি)
- যাদের ওজন স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি
- যারা পর্যাপ্ত সূর্যের আলোর সংস্পর্শে আসেন না
- যারা দিনের বেশিরভাগ সময় ঘরে, স্কুল/কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় এবং অফিসে থাকে
- লিভার অথবা কিডনির কোনো সমস্যা থাকলে
- শ্যামবর্ণ অথবা গাঢ়বর্ণের ব্যক্তি

বিস্তারিত জানতে: 017 6666 0594

ল্যাবএইড লিমিটেড (ডায়াগনস্টিক)

বাড়ি ১, রোড ৪, ধানমন্ডি, ঢাকা , ফোন : ৫৮৬১০৭৯৩-৮

টার্নার সিনড্রোম : কন্যাশিশুর কম উচ্চতা

অধ্যাপক ডা. ইন্দ্রজিৎ প্রসাদ
এমবিবিএস (ডিএমসি), এফসিপিএস (মেডিসিন)
এমডি (এন্ডোক্রাইনোলজি,বারডেম)
মেডিসিন, ডায়াবেটিস, থাইরয়েড ও হরমোন রোগবিশেষজ্ঞ
অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, এন্ডোক্রাইনোলজি বিভাগ,
ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল
চেম্বার : ল্যাবএইড স্পেশালাইজড হাসপাতাল

টার্নার সিনড্রোম কন্যাশিশুর জন্মগত ত্রুটি। জন্মের পর অন্য শিশুদের মতো এতে আক্রান্ত শিশুরা স্বাভাবিক বিকাশ লাভ করতে পারে না। এমনকি এই শিশুরা ত্রুটিযুক্ত ডিম্বাশয় নিয়ে বেড়ে ওঠার কারণে সময়মতো তাদের বয়ঃসন্ধি হয় না। প্রায় ৮০ থেকে ৯০ ভাগেরই সময়মতো মাসিক শুরু হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় এই রোগ তখন নির্ণয় হয়, যখন বয়স হয়ে যাওয়ার পরও উচ্চতা বৃদ্ধি না হলে বা বয়ঃসন্ধি না এলে আক্রান্ত শিশুকে অভিভাবকেরা চিকিৎসকের কাছে নিয়ে আসেন। কম উচ্চতা, ত্রুটিযুক্ত ওভারি, ছোট যৌনাঙ্গ, উচ্চ রক্তচাপ ও হৃদ্‌রোগ, কিডনি জটিলতাসহ নানা লক্ষণ দেখা দেয় এতে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে রোগ নির্ণয় করার পর, নির্দিষ্ট হরমোন থেরাপির মাধ্যমে এর চিকিৎসা করা হয়। যত আগে চিকিৎসা কার্যক্রম শুরু করা যায়, চিকিৎসা কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা ততটাই বেশি থাকে।

টার্নার সিনড্রোম কী

সাধারণত একটি স্বাভাবিক মানবদেহে ৪৬টি ক্রোমোজম থাকে। কিন্তু টার্নার সিনড্রোমে শিশু ভ্রূণ থেকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ার সময় একটা এক্স ক্রোমোজম হারিয়ে যায় বা পরিবর্তিত হয়। তাই এতে আক্রান্ত শিশুদের ৪৬টির পরিবর্তে ৪৫টি ক্রোমোজম থাকে। একটি এক্স ক্রোমোজম অনুপস্থিত থাকে। ফলে শিশু নানা ত্রুটিযুক্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। আর বড় হতে থাকে নানা শারীরিক জটিলতা সঙ্গে নিয়ে। ত্রুটিযুক্ত ডিম্বাশয়ের কারণে সময়মতো বয়ঃসন্ধি আসে না। অন্য শিশুদের তুলনায় তারা লক্ষণীয়ভাবে কম উচ্চতার হয়। যদিও শতকরা ৯৯ ভাগ টার্নার সিনড্রোমের ভ্রূণ গর্ভে ২৮ সপ্তাহ হওয়ার আগেই মারা যায় ও গর্ভপাত ঘটে। এরপরও গড়ে প্রতি ২ হাজার ৫০০ জীবিত কন্যাশিশুর মধ্যে একজন এ সমস্যায় আক্রান্ত হয়।

লক্ষণ ও উপসর্গ

- খর্বাকৃতি বা বয়সের তুলনায় ঠিকমতো উচ্চতা বাড়ে না।
- হাত-পা ফুলে যায়।
- ঘন ঘন কান-পাকা সমস্যা দেখা দেয়।

আমেরিকান এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট হেনরি হুবার্ট টার্নার ১৯৩৮ সালে সর্বপ্রথম টার্নার সিনড্রোমের ধারণা দেন।

- ত্রুটিযুক্ত ডিম্বাশয় ও ক্ষুদ্র যৌনাঙ্গ।
- বয়ঃসন্ধি না পাওয়া।
- গলায় ভাঁজ ও ছোট থুতনি।
- ঢেউ খেলানো বা কোঁচকানো ঘাড়। ঘাড়ের আয়তন কম।
- চওড়া বুক বা স্তন যুগলের মধ্যে বেশি দূরত্ব।
- স্তনবৃন্ত স্বাভাবিক অবস্থানে থাকে না।
- বয়স বাড়তে থাকলে পা ও মেরুদণ্ড বেঁকে যায়।

রোগনির্ণয়

অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, বয়ঃসন্ধি না পাওয়া বা মাসিক শুরু না হওয়ার জটিলতা নিয়ে রোগী চিকিৎসকের কাছে আসেন। যদিও লক্ষণ বা উপসর্গ দেখেই চিকিৎসক বুঝতে পারেন যে, এটি টার্নার সিনড্রোমের কারণে হচ্ছে। তবু নিশ্চিত হতে কিছু নির্দিষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন পড়ে। এ ক্ষেত্রে ক্রোমোজমের পরীক্ষা— ক্যারিয়োটাইপিং করা হয়। পাশাপাশি গোনাডোট্রপিন ও সেক্স হরমোনের সঙ্গে জরায়ু ও ডিম্বাশয়ের আলট্রাসনোগ্রাম করার প্রয়োজন হয়। এ ছাড়াও জন্মের আগেই টার্নার সিনড্রোমে আক্রান্ত গর্ভস্থ শিশুকে চিহ্নিত করা যায়। সে ক্ষেত্রে সন্তান মায়ের পেটে আসার ১০ থেকে ১৮ সপ্তাহের মধ্যে আলট্রাসনোগ্রাম, সিভিএস টেস্ট ও অ্যাম্নিওসেন্টেসিস টেস্ট করে নিশ্চিত হতে হয়।

চিকিৎসা

টার্নার সিনড্রোমে আক্রান্ত শিশুকে ৭ বছর থেকে ১০ বছর বয়সের মধ্যেই গ্রোথ হরমোন থেরাপি দিয়ে উচ্চতা বৃদ্ধির চিকিৎসা দেওয়া হয়। খুব ছোট বয়সে এই রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হলে এই থেরাপি বেশি কার্যকর হয়। যত দ্রুত থেরাপি শুরু করা যায়, এতে ততটাই উচ্চতা বৃদ্ধি ও হাড়ের গঠনের উন্নতি সাধন সম্ভব হয়। টার্নার সিনড্রোমের চিকিৎসায় আরেকটি ধাপ হলো—ইস্ট্রোজেনথেরাপি। এ পদ্ধতিতে ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরন হরমোনের মাধ্যমে বয়ঃসন্ধিজনিত সমস্যার চিকিৎসা করা হয়। এটি ১০-১১ বছরের মধ্যেই শুরু করতে পারলে ভালো হয়।

ইস্ট্রোজেনথেরাপি স্তন সমস্যার সমাধান ও জরায়ুর আকার বৃদ্ধি করে। টার্নার সিনড্রোমের রোগীদের মধ্যে খুব অল্প নারী চিকিৎসা ছাড়াই গর্ভধারণে সক্ষম হন। কিন্তু তাদের অধিকাংশই ত্রুটিযুক্ত ডিম্বাশয় নিয়ে বেড়ে ওঠার ফলে গর্ভধারণ করতে ব্যর্থ হয়। এ ক্ষেত্রে এমব্রায়ো পদ্ধতি সহায়ক হতে পারে। কিন্তু টার্নার সিনড্রোমের রোগীর গর্ভধারণ-সংক্রান্ত জটিলতা খুব বেশি থাকায়, সফলতার হার খুবই কম। এ ছাড়াও টার্নার সিনড্রোমে শিশুর উপসর্গভিত্তিক চিকিৎসারও প্রয়োজন হয়। এই রোগে শিশুর উচ্চ রক্তচাপ, কান, হাড়ের সমস্যা, কোলেস্টেরল ও থাইরয়েডের চিকিৎসা দরকার পড়ে।

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের তথ্যমতে, বিশ্বে প্রতি ২৫০০ জীবিত কন্যাশিশুর মধ্যে ১ জন টার্নার সিনড্রোমে আক্রান্ত।

অটিজম : শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশজনিত সমস্যা

ডা. নাজনীন আক্তার (রুবী)
এমবিবিএস, বিসিএস (স্বাস্থ্য), এফসিপিএস (শিশু)
এফসিপিএস (শিশু নিউরোলজি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট)
শিশু নিউরোলজি বিশেষজ্ঞ
সহযোগী অধ্যাপক, শিশু নিউরোলজি বিভাগ
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
চেম্বার : ল্যাবএইড ডায়াগনস্টিক হাসপাতাল, ধানমন্ডি

অটিজমকে অনেকে মানসিক সমস্যা ভেবে থাকেন, কিন্তু এটি মূলত স্নায়বিক। অটিজমে আক্রান্ত হলে মস্তিষ্কের স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হয়। ফলে শিশুদের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রসমূহে বেশ সমস্যা লক্ষ করা যায়। শিশুর জন্মের প্রথম তিন বছরের মধ্যে এর লক্ষণ প্রকাশ পায়। চিকিৎসাশাস্ত্রে এই অবস্থার নাম অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডার।

অটিজম কী

শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশজনিত সমস্যার নাম অটিজম। স্নায়ুতন্ত্রের গঠন ও বৃদ্ধির অস্বাভাবিকতার জন্য এই সমস্যা হয়ে থাকে। এতে আক্রান্ত হলে শিশুর স্বাভাবিক শারীরিক বৃদ্ধি ঘটলেও, মানসিকভাবে ততটা বেড়ে ওঠে না। এর ফলে শিশুর নানা রকম অসুবিধা তৈরি হয়। পুনরাবৃত্তিমূলক আচরণ, অস্পষ্ট উচ্চারণ কিংবা কথা না বলার মতো নানা সমস্যা দেখা দেয়। সামষ্টিকভাবে একে অটিজম বলা হয়। সাধারণত ছেলে বাচ্চাদের মধ্যে এই রোগের প্রকোপ বেশি দেখা যায়।

লক্ষণ ও উপসর্গ

- সমবয়সীদের সঙ্গে না মেশা, একা একা থাকার অভ্যাস।
- এক থেকে দেড় বছর বয়সের মধ্যে কোনো অর্থবহ শব্দ কিংবা অন্তত বা, দা, না ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ না করা।
- আচরণের পুনরাবৃত্তি। যেমন—ভিন্ন ভিন্ন খেলনা দিলেও, খেলার ধরন একই রকম।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যমতে, বিশ্বে প্রতি ১০০ জন শিশুর মধ্যে ১ জন শিশু অটিজমে আক্রান্ত।

- আই কন্ট্যাক্ট বা চোখে চোখ রেখে কথা বলতে না পারা।
- কথা বলায় জড়তা কিংবা কথা না বলা।
- শিশুর ধৈর্য কম থাকা এবং দ্রুত মনোযোগ হারিয়ে ফেলা।
- হাত নেড়ে কোনো কিছু ইঙ্গিত না করা।
- দুই শব্দের বাক্য দুই বছর বয়সে তৈরি করতে পারছে না।
- কিছু শব্দ বা বাক্য শিখে পরবর্তী সময়ে দ্রুত ভুলে যায়।

অটিজমে কী করবেন

শিশুর অটিজমের লক্ষণ দেখা দিলে অবিলম্বে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

- অটিজমের লক্ষণগুলো পরিবর্তনশীল। যা হালকা থেকে মাঝারি, মাঝারি থেকে গুরুতর হতে পারে। তাই প্রাথমিক অবস্থায় শনাক্তকরণ ও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করলে এর তীব্রতা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। তবে অটিজমের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশুর পূর্ণাঙ্গ নিরাময় সম্ভব নয়।

অটিজম নিয়ন্ত্রণে কয়েকটি প্রচলিত পদ্ধতি রয়েছে। যেমন : বিহেভিয়ার থেরাপি, স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপি, অকুপেশনাল থেরাপি ইত্যাদি। আর এই পুরো প্রক্রিয়ায় ভালো ফল পেতে থেরাপিস্ট ও পরিবারের সদস্যদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়।

- অকুপেশনাল থেরাপিতে দৈনন্দিন কাজকর্ম। যেমন : খাবার খাওয়া, জামাকাপড় পরিধান করা, চলাফেরা ও নিজেকে নিরাপদ রাখার কৌশল সম্পর্কে আক্রান্ত শিশুর বিকাশ লাভে সহযোগিতা করা হয়।
- দেরিতে কথা বলা কিংবা কথা না বলা এবং ভাষা ও উচ্চারণগত সমস্যার ক্ষেত্রে স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপি খুব উপকারে আসে।
- আচার-আচরণ ও পারস্পরিক যোগাযোগ স্থাপনে শিশুর বিকাশ ও দক্ষতা অর্জনে বিহেভিয়ার থেরাপি দেওয়া হয়ে থাকে।
- এ ছাড়াও এডুকেশন থেরাপিসহ নানা থেরাপি অটিজমের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। শিশুর প্রয়োজন অনুযায়ী নিয়মিত এ থেরাপি সেবাগুলো নিতে হয় এবং বয়স ও শিশুর উন্নয়নের ওপর ভিত্তি করে থেরাপির ধরন পরিবর্তন করা হয়।

কিছু ওষুধের সঙ্গে জড়িত কিছু জটিলতার জন্য প্রয়োজন হতে পারে। বিশেষ করে কিছুদিন অতিরিক্ত চঞ্চলতা, ঘুমের স্বল্পতা ও আচরণগত সমস্যা ইত্যাদি।

- এই বাচ্চাদের ক্ষেত্রে গ্লুটেইন-ফ্রি ও ক্যাসেইন-ফ্রি খাবার সহায়ক। অনেক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় তার প্রমাণ পাওয়া গেছে।
- ওমেগা থ্রি, ভিটামিন বি৬, বি১২, ভিটামিন ডি ও সি সাপ্লিমেন্টও উপকারী।

দ্রুত বহুমাত্রিক চিকিৎসাব্যবস্থা এই বাচ্চাদের সমাজে পুনর্বাসনের জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

অটিজমের লক্ষণ-সংবলিত শিশুদের অভিভাবকের জন্য করণীয়

- লক্ষণ গোপন করবেন না।
- হতাশ ও বিভ্রান্ত হবেন না।
- দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
- নিজে প্রশিক্ষিত হোন এবং অন্যদের সচেতন করুন।

বাংলাদেশ সরকারের ডিজঅ্যাবিলিটি ইনফরমেশন সিস্টেমের তথ্যানুসারে, দেশে বর্তমানে অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মানুষের সংখ্যা ৭৮ হাজার ২১১ জন।

অধ্যাপক ডা. মোঃ রুহুল আমিন
এমবিবিএস, বিসিএস (স্বাস্থ্য), এমডি (ইএম-বিএসএমএমইউ)
ডায়াবেটিস, থাইরয়েড ও হরমোন বিশেষজ্ঞ
অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান (প্রাক্তন), এন্ডোক্রাইনোলজি বিভাগ,
ঢাকা মেডিকেল কলেজ
চেম্বার : ল্যাবএইড কার্ডিয়াক হাসপাতাল, ধানমন্ডি

শিশুদের ডায়াবেটিস ও প্রতিরোধে করণীয়

সদ্য ভূমিষ্ঠ হওয়া শিশুটিও ডায়াবেটিস নিয়ে জন্মাতে পারে। বয়স্কদের মধ্যে আক্রান্তের হার বেশি থাকলেও ডায়াবেটিস হতে পারে যেকোনো বয়সে। বর্তমানে শিশুদের মধ্যেও বাড়ছে ডায়াবেটিস। বেশির ভাগ শিশু শৈশবে টাইপ-১ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হলেও বিগত বছরগুলোতে আশঙ্কাজনক হারে বেড়েছে টাইপ-২ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত শিশুর সংখ্যা। তবু শিশুদের ডায়াবেটিসের ব্যাপারে সামাজিক সচেতনতার বেশ অভাব লক্ষ করা যায়। যার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই রোগনির্ণয় যেমন বিলম্বিত হয়, ঠিক তেমনি এতে জটিলতাও অনেকাংশে বেড়ে যায়।

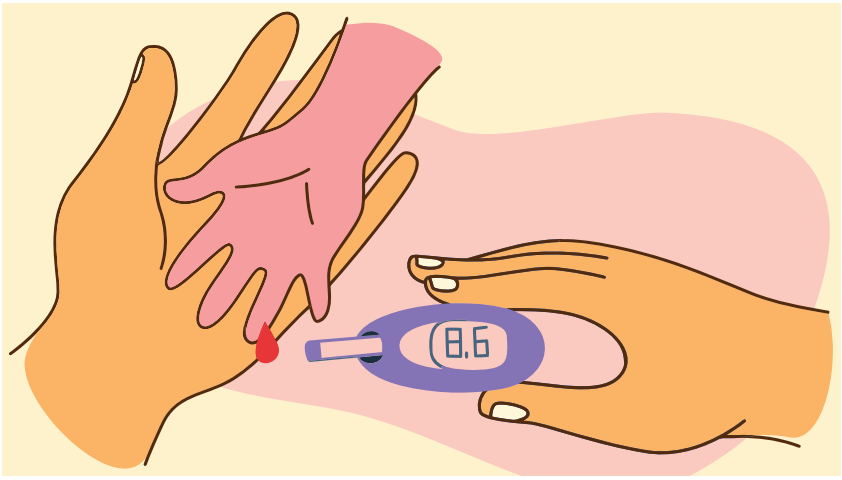

ডায়াবেটিস কী

ডায়াবেটিস শরীরের একটি বিপাকজনিত সমস্যা, এই রোগে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ স্বাভাবিকের চেয়ে বৃদ্ধি পায়। এটি ইনসুলিন নামক হরমোনের অভাবে অথবা এর কর্মক্ষমতা লোপ পাওয়ার জন্য হয়ে থাকে। আমাদের দেহের অগ্ন্যাশয় থেকে ইনসুলিন নামক হরমোনটি নিঃসৃত হয়, যা বিপাক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেহের শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। ইনসুলিনের কাজ হলো গ্লুকোজকে মানুষের দেহের কোষে পৌঁছে দেওয়া। এরপর সেই গ্লুকোজ ব্যবহার করে শরীরের কোষগুলো শক্তি উৎপাদন করে। কিন্তু যখন ইনসুলিনের উৎপাদন কমে যায় বা ইনসুলিন উৎপাদন হওয়ার পরও যখন তা ঠিকভাবে কাজ করতে পারে না, তখন শরীরে অতিরিক্ত গ্লুকোজ থাকে। খালি পেটে যদি গ্লুকোজের মাত্রা ৭-এর বেশি থাকে আর খাওয়ার পর যদি ১১-এর বেশি থাকে, তখন সেই অবস্থাকে ডায়াবেটিস বলে।

শিশুদের ডায়াবেটিসের ধরন :

নিওনেটাল ডায়াবেটিস

শিশুর জন্মের পর থেকে ৬ মাস বয়সের মধ্যে যে ডায়াবেটিস হয়, তাকে বলা হয় নিওনেটাল ডায়াবেটিস। সাধারণত জেনেটিক মিউটেশন বা ত্রুটির কারণে এই ডায়াবেটিস হয়ে থাকে।

বিশ্বের প্রায় ৪২ কোটি মানুষ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত। এদের মধ্যে ২৪ কোটি মানুষ জানেনই না যে তাদের ডায়াবেটিস রয়েছে।

বয়ঃসন্ধিকালের ডায়াবেটিস বা মডি

সাধারণত বয়ঃসন্ধিকালের শুরুতে এই ধরনের ডায়াবেটিস হয়ে থাকে তাই একে ম্যাচিউরিটি-অনসেট ডায়াবেটিস অব দ্য ইয়াং (মডি) বা বয়ঃসন্ধিকালীন ডায়াবেটিস বলা হয়। এটিও জেনেটিক মিউটেশন বা ত্রুটির কারণে হয়ে থাকে।

টাইপ-১ ডায়াবেটিস

সাধারণত শিশুরা টাইপ-১ ডায়াবেটিসে বেশি আক্রান্ত হয়। বংশগত ও পারিপার্শ্বিক নানা কারণে এই ডায়াবেটিস হতে পারে। এতে একধরনের ইমিউন সিস্টেম (রোগ প্রতিরোধব্যবস্থা) জটিলতায় দেহের অগ্ন্যাশয়ের বিটা কোষগুলো দ্রুত ধ্বংস হয়ে ইনসুলিন উৎপাদনের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। এতে আক্রান্ত শিশুরা দিন দিন শুকিয়ে যায়, ঘন ঘন প্রস্রাব করে আর দ্রুত অসুস্থ হয়ে পড়ে। এ ধরনের ডায়াবেটিসে আজীবন ইনসুলিনের ওপর নির্ভরশীল থাকতে হয়।

টাইপ-২ ডায়াবেটিস

শরীরে ইনসুলিন উৎপন্ন হওয়া সত্ত্বেও যখন তা ঠিকভাবে কাজ করতে পারে না, তখন এই ডায়াবেটিস হয়ে থাকে। শিশুদের মধ্যে টাইপ-২ ডায়াবেটিসের একক প্রধান কারণ হলো অতিরিক্ত ওজন। যাদের ওজন বেশি, শরীরে অতিমাত্রায় মেদ, কায়িক পরিশ্রম করেন না—তাদের এ রোগ হওয়ার আশঙ্কা বেশি থাকে। তবে উভয় ক্ষেত্রেই কিছু জিনগত বৈশিষ্ট্য এ রোগ হওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

শিশুদের ডায়াবেটিসের লক্ষণসমূহ

- ঘন ঘন প্রস্রাব ও প্রস্রাবে জ্বালাপোড়া।
- বিছানায় প্রস্রাব করা বন্ধ হওয়ার পর, পুনরায় ঘুমের মধ্যে প্রস্রাব করা।
- অতিরিক্ত দুর্বলতা ও সারাক্ষণ ঘুম ঘুম ভাব।
- প্রচণ্ড পিপাসা ও ঘন ঘন ক্ষুধা লাগা।
- ঘা শুকাতে বেশি সময় লাগা।
- শিশুর শারীরিক বৃদ্ধিতে সমস্যা।

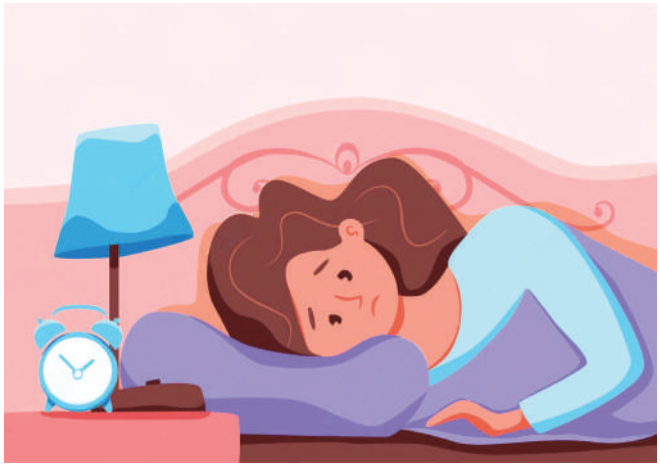

- ওজন হ্রাস পাওয়া এবং উৎসাহ-উদ্দীপনা কমে যাওয়া।
- শুষ্ক ত্বক ও দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পাওয়া।
- পা অবশ বোধ হওয়া বা ঝিমঝিম করা, মনোযোগ হ্রাস পাওয়া।
- ঘন ঘন বমি ও পেটের পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ

- শিশুর ডায়াবেটিসের ব্যাপারে নিশ্চিত হলে ভেঙে না পড়ে মনোবল দৃঢ় করতে হবে এবং সঠিকভাবে সন্তানের ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে মনোযোগী হতে হবে।
- প্রথমেই পুষ্টিবিদ ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শে একটি খাদ্যতালিকা তৈরি করে নিতে হবে, কারণ খাদ্য নিয়ন্ত্রণের ওপর ডায়াবেটিসের নিয়ন্ত্রণ অনেকটা নির্ভরশীল।
- ডায়াবেটিসে আক্রান্ত শিশুদের জন্য অধিক আঁশ ও শর্করাযুক্ত সুষম স্বাস্থ্যকর খাদ্যতালিকা তৈরি করতে হবে, যা শিশুর রক্তের সুগার লেভেল ঠিক রাখবে এবং শিশুর শরীরের স্বাভাবিক বৃদ্ধিকেও ব্যাহত করবে না।
- সন্তান স্কুলে যাওয়ার সময় তার পকেটে বা ব্যাগে মিষ্টি জাতীয় খাবার রেখে দিতে হবে। স্কুলের শিক্ষকদেরও এ ব্যাপারে অবহিত করতে হবে।

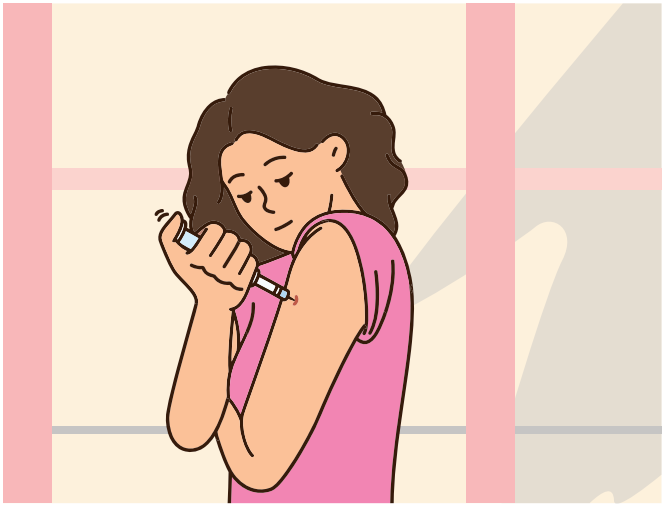

- সঠিকভাবে ইনসুলিন প্রয়োগবিধি জানতে হবে এবং শিশুকে তা উপযুক্ত বয়সে শেখাতে হবে।
- মুটিয়ে যাওয়া বা স্থূলতা ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়ায়। শুয়ে-বসে, টিভি দেখে, কম্পিউটার গেমস খেলে সময় কাটানোর চেয়ে বাইরের খেলাধুলার দিকে সন্তানকে আকৃষ্ট করতে হবে।
- বাবা-মাকে সন্তানের স্বাস্থ্যঝুঁকির বিষয়ে অধিক সতর্ক থাকতে হবে। ডায়াবেটিসের লক্ষণ ও উপসর্গ দেখা দিলে দ্রুত একজন ডায়াবেটিস ও হরমোন রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হোন এবং সুচিকিৎসা গ্রহণ করুন।

বর্তমানে দেশে প্রায় ১ কোটি ৩১ লাখ মানুষ ডায়াবেটিসে ভুগছেন এবং সারা বিশ্বের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান অষ্টম।

Lyfovit

Multivitamin with L-Lysine Tablet

1st time in Bangladesh L-LYSINE FROM GERMANY

For desired healthy growth

- Improves appetite
- Promotes growth in height & weight
- Helps in building of muscle protein
- Helps to absorb Calcium
- Ensures energy production

Dosage & Administration

Children from 01 year of age:
1 -3 Tablets daily depending on the age & physical condition

Adult: 3 Tablets daily

*To be dispensed only by or the prescription of a registered physician

Labaid pharma Quality First...

Scan here to find our page instantly :
"Like" us on facebook
fb.com/labaidpharmaceuticals

LABAID PHARMACEUTICALS LIMITED
Bay Tower (Level 2), House 23, Gulshan 1, Dhaka-1212
Phone : 88 02 9899910, Fax : 88 022 22215497
info@labaidpharma.com, www.labaidpharma.com

নবজাতকের জন্ডিস ও প্রতিকার

অধ্যাপক ডা. মোঃ আশরাফুল ইসলাম
এমবিবিএস, এফসিপিএস (মেডিসিন), এমডি (গ্যাস্ট্রো)
মেডিসিন, পরিপাকতন্ত্র ও লিভার রোগ বিশেষজ্ঞ
অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজি বিভাগ (প্রাক্তন)
ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল
চেম্বার : ল্যাবএইড স্পেশালাইজড হাসপাতাল, ধানমন্ডি

শিশুর জন্মের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জন্ডিস দেখা দিতে পারে। নবজাতকের জন্ডিসেরও রয়েছে নানা ধরন। কখনো তা হতে পারে খুবই সাধারণ জন্ডিস, যা আপনাআপনি সেরেও যায়। আবার কিছু জন্ডিস আছে এমন—যা হতে পারে মস্তিষ্ক জটিলতার মতো মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণ। এমনকি জন্ডিসে মৃত্যুও হতে পারে নবজাতকের।

জন্ডিস কী

জন্মের পর শিশুর যকৃৎ পুরোপুরি কর্মক্ষম হয়ে উঠতে একটু দেরি হলে রক্তে বিলিরুবিনের মাত্রা বেড়ে গিয়ে জন্ডিস দেখা দেয়। সাধারণত নবজাতকের শরীরে লোহিত রক্তকণিকা বেশি থাকে, আর কোনো কারণে তা ভাঙতে শুরু করলে, বিলিরুবিন বেড়ে যায়। বিলিরুবিন হলো হলুদ রঙের একটি রঞ্জক পদার্থ। রক্তে এই পদার্থটির পরিমাণ স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি হলে চোখ, হাতের তালু ও সমস্ত শরীর হলুদ রং ধারণ করে। এই পরিস্থিতিকে জন্ডিস বলা হয়।

লক্ষণ ও উপসর্গ

- নবজাতকের চোখের সাদা অংশ ও ত্বকের রং হলুদ বর্ণ ধারণ করে।
- হলদে ভাব শুরুতে মুখমণ্ডলে দেখা যায়। তারপর আস্তে আস্তে সমস্ত শরীর হলুদ হয়। সঙ্গে সঙ্গে হাত ও পায়ের তালুও হলুদ হয়ে যায়।
- পেট ফাপা, ঝিমুনি ও বমি বমি ভাব।
- তীব্র জ্বর।

নির্দিষ্ট সময়ে জন্ম নেওয়া ৬০ শতাংশ এবং নির্দিষ্ট সময়ের আগে জন্ম নেওয়া ৮০ শতাংশ শিশু জন্মের প্রথম সপ্তাহে জন্ডিসে আক্রান্ত হয়।

- খেতে না পারা এবং নড়াচড়া কমে যাওয়া।
- শরীর বেশি ঠান্ডা হওয়া।
- কখনো খিঁচুনিও হতে পারে।

নবজাতকের জন্ডিসের ধরন

ফিজিওলজিক্যাল জন্ডিস

শতকরা ৭০ থেকে ৮০ ভাগ নবজাতকেরই জন্মের পরপর জন্ডিস হতে পারে। এর মধ্যে ৫০ শতাংশের ক্ষেত্রে ফিজিওলজিক্যাল জন্ডিস দেখা যায়। এটি খুবই সাধারণ জন্ডিস। জন্মের দুই থেকে তিন দিনের মাথায় যে জন্ডিস দেখা দেয় এবং সাত-আট দিনেই ভালো হয়ে যায় তাকে ফিজিওলজিক্যাল জন্ডিস বা স্বাভাবিক বলেই ধরে নেওয়া হয়। এতে শিশুর তেমন একটা ক্ষতি হয় না। এমনকি এই জন্ডিস আপনাআপনি সেরেও যায়।

প্যাথোলজিক্যাল বা ক্লিনিক্যাল জন্ডিস

এই ধরনের জন্ডিস জন্মের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই দেখা দেয়। প্যাথোলজিক্যাল বা ক্লিনিক্যাল জন্ডিস সাধারণত জটিল হয়ে থাকে। এতে শিশুর শরীরে নানা ধরনের অস্বাভাবিক পরিবর্তনও দেখা দেয়। এই জন্ডিসেরও রয়েছে নানা ধরন। যেমন—

- হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়া : এ ক্ষেত্রে নবজাতকের শরীরে রক্তশূন্যতা দেখা দেয়। সেই সঙ্গে লিভার ও প্লীহা বড় হয়ে যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে রক্তের বিলিরুবিন দ্রুত বাড়তে থাকে। যথাসময়ে সঠিক চিকিৎসা গ্রহণ না করলে নবজাতকের মৃত্যু হতে পারে।

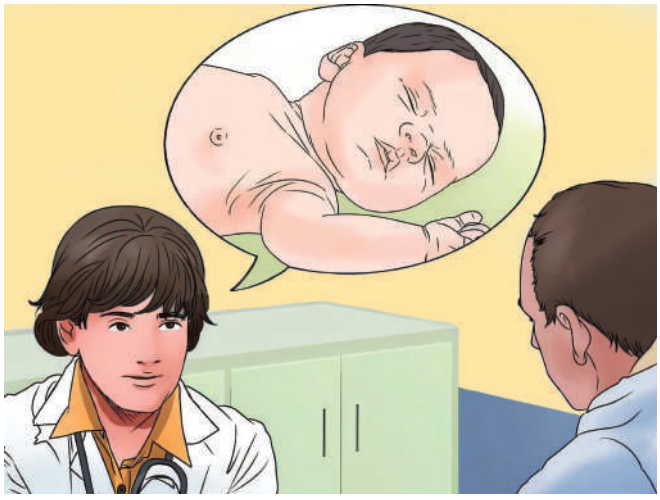

- প্রি-ম্যাচিউরড শিশু : এই নবজাতকের জন্ডিসের মাত্রা বেশি ও দীর্ঘমেয়াদি হয়।
- রক্তের গ্রুপজনিত জন্ডিস : নবজাতকের রক্তের গ্রুপ আর এইচ পজিটিভ এবং মায়ের রক্তের গ্রুপ আর এইচ নেগেটিভ হলে সদ্যোজাত শিশুর জন্ডিস হতে পারে।
- ইনফেকশন : নবজাতকের রক্তে ইনফেকশন ছড়িয়ে গেলে একে সেপটিসেমিয়া বলে। এই পরিস্থিতিতে শিশুকে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে সঠিক অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করতে হয়।
- মায়ের ডায়াবেটিস : কোনো নবজাতকের মায়ের ডায়াবেটিস থাকলে নবজাতকের জন্ডিস হতে পারে। এ ক্ষেত্রে নবজাতকের শর্করা লেভেল স্বাভাবিক রাখতে ঘন ঘন বুকের দুধ খাওয়াতে হবে।

যেসব নবজাতক ঝুঁকিতে

- যাদের জন্মের সময় ওজন কম থাকে।
- সময়ের আগেই জন্ম নেওয়া শিশু (প্রিম্যাচিউর বেবি)।
- আগেও যদি একই পরিবারের শিশুর জন্ডিসের ইতিহাস থাকে।
- জন্ডিস যদি প্রথম ২৪ ঘণ্টায়ই দেখা যায়।
- যেসব মায়ের অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস থাকে।
- বুকের দুধ পান করা শিশু।
- মায়ের রক্তের গ্রুপ যদি নেগেটিভ বা ও গ্রুপের হয়।

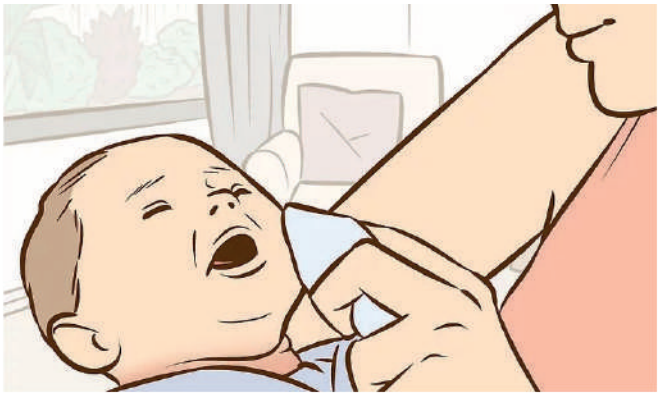

রোগনির্ণয়

রক্তের বিলিরুবিন পরীক্ষার মাধ্যমে জন্ডিস নির্ণয় করা যায়। বাচ্চা ও মায়ের রক্তের গ্রুপ, কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট, রেটিকুলোসাইট কাউন্ট, ডাইরেক্ট কমব্স টেস্ট ও টর্চ স্ক্রিনিংসহ নানা পরীক্ষা করা হয় জন্ডিসের কারণ নির্ণয় করার জন্য।

চিকিৎসা

নবজাতকের রক্তে বিলিরুবিনের মাত্রা কেমন, শিশু কত সপ্তাহে জন্মগ্রহণ করেছে, বিলিরুবিন কী পরিমাণে বাড়ছে, তার ওপর চিকিৎসাব্যবস্থা নির্ভর করে। জন্ডিসের মাত্রা বেশি মনে হলে হাসপাতালে এনে ফটোথেরাপি দিতে হয়। ফটোথেরাপি খুব কার্যকর একটি চিকিৎসাপদ্ধতি। নীল আলোর ফটোথেরাপি, বিলি ব্লাকেট ও লেড ফটোথেরাপি জন্ডিসের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। তবে জন্ডিসের ধরন ও বিলিরুবিনের মাত্রা নির্দিষ্ট সীমার বাইরে গেলে রক্ত বদল করার প্রয়োজনও হতে পারে। এ ক্ষেত্রে নাভির শিরাপথে বাচ্চার শরীরের রক্তের দ্বিগুণ পরিমাণ রক্ত দিয়ে এই চিকিৎসা করা হয়। মনে রাখা দরকার রক্তে বিলিরুবিন খুব বেশি বেড়ে গেলে তা মস্তিষ্কে পৌঁছে যায় এবং স্থায়ীভাবে শিশুর মস্তিষ্কের ক্ষতি করতে পারে।

জন্ডিসের ঝুঁকি নির্ণয়ে সকল নবজাতকের ৩-৫ দিন বয়সে রক্তে বিলিরুবিনের মাত্রা পরীক্ষা করানো উচিত।

কামরুন আহমেদ
সিনিয়র পুষ্টিবিদ
চেম্বার : ল্যাবএইড হাসপাতাল

বিভিন্ন বয়সে নারীদের পুষ্টি

পুষ্টি হলো স্বাস্থ্যকর জীবনের মূল ভিত্তি। নারীদের পুষ্টি আলোচনা যখন শুরু হয় তখন এটি একটি বিস্তৃত ও গভীর বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করে, যা বিভিন্ন বয়সী নারীদের স্বাস্থ্য ও জীবনের প্রতিটি ধাপের সঙ্গে সম্পর্কিত। পুষ্টি বিশেষজ্ঞদের মতে, নারীদের জন্য সঠিক পুষ্টি গ্রহণ নিশ্চিত করা শুধু তাদের স্বাস্থ্যের জন্য নয়, পুরো সমাজের সমৃদ্ধি ও উন্নতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সত্যি নারীদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা নির্ভর করে তাদের পুষ্টির ওপরে, যা তাদের দৈনন্দিন কার্যকলাপ, কাজের সক্ষমতা এবং সামগ্রিক জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে সহায়ক। শিশু, কিশোরী ও প্রাপ্তবয়স্কা নারী এই তিনটি বয়সের ধাপে পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব ভিন্ন ভিন্ন হলেও তাদের সকলেরই সুষম ও সঠিক পুষ্টি প্রয়োজন।

শিশুর পুষ্টি

নারীদের পুষ্টি মূলত তাদের শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার্স ফর ডিজিস কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশনের (CDC) মতে, সঠিক পুষ্টি শিশুদের স্বাস্থ্যকর বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য অপরিহার্য এবং এটি জীবনের প্রথম ছয় বছরের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

শিশুরা তাদের ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্য ও শক্তির ভিত্তি স্থাপন করে এই সময়ে যা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করে । শিশুর বিকাশ ও বৃদ্ধির জন্য প্রথম ছয় মাস মায়ের বুকের দুধ যথেষ্ট। জন্মের এক ঘণ্টার মধ্যে মায়ের বুকের দুধ দেওয়া প্রয়োজন। ছয় মাসের পরে বাড়তি খাবার দিতে হবে। তবে খাবার হতে হবে জীবাণুমুক্ত। দুই বছর থেকে বাড়ির সব স্বাভাবিক খবর খেতে পারবে। পাঁচ বছর পর্যন্ত মস্তিষ্কের বৃদ্ধি হয় এবং শারীরিক বিকাশ হয়, এই সময় শিশুর সঠিক খাদ্যাভ্যাস গড়ে ওঠে, তাই শিশুকে সব পুষ্টি উপাদানসমৃদ্ধ খাবার দিতে হবে।

ইউনিসেফের সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে পাঁচ বছরের কম বয়সী প্রতি ৩ জন শিশুর মধ্যে ২ জন শিশু সুষম খাদ্য থেকে বঞ্চিত।

কিশোরী বয়সের পুষ্টি

এ সময় শারীরিক ও হরমোনজনিত পরিবর্তন হয়। এ সময় পুষ্টিকর খাবার এই পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে সাহায্য করে। WHO-এর তথ্যমতে, কিশোরী বয়সে মেয়েদের পুষ্টি ঘাটতি থাকলে ভবিষ্যৎ প্রজননস্বাস্থ্য এবং রোগ প্রতিরোধক্ষমতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। সঠিক পুষ্টির অভাবে কিশোরী মেয়েরা এনিমিয়া, অপুষ্টি ও অন্যান্য স্বাস্থ্য সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে, যা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। বয়ঃসন্ধিকালে বিশেষ কিছু খাদ্য উপাদান একান্ত জরুরি। এই সময় খেয়াল রাখতে হবে, খাদ্যতালিকায় মাইক্রো-নিউট্রিয়েন্ট এবং ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্টের যেন অভাব না থাকে। বিশেষ করে প্রাণিজ প্রোটিন—মাছ, মাংস, দুধ, ডিম প্রতিদিনের খাদ্যতালিকাতে রাখতে হবে। পেশি বৃদ্ধি এবং হাড়ের গঠন হয় এ সময়। ফলিক অ্যাসিড, আয়রন, ক্যালসিয়ামজাতীয় খাবার খাদ্যতালিকাতে রাখতে হবে।

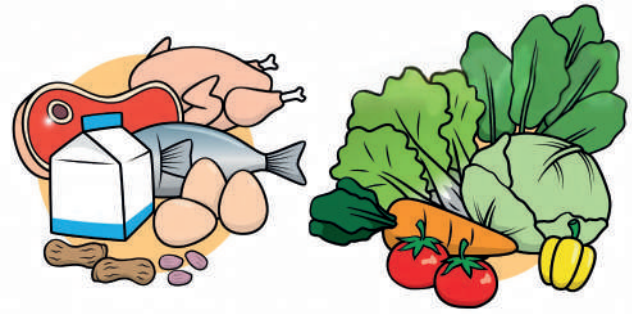

বাংলাদেশে ৪৩% কিশোরী রক্ত স্বল্পতায় ভুগে থাকে। তাই প্রতিদিন ১৬ মিলিগ্রাম আয়রন কিশোরীদের খাদ্যতালিকায় রাখা উচিত। সবুজ শাকসবজি, বিট ও আঙুর আয়রনসমৃদ্ধ খাবার।

পূর্ণ বয়স্ক নারীদের পুষ্টি

একজন পূর্ণ বয়স্ক নারীর পুষ্টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নারীদের জন্য পুষ্টি শুধু শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য নয় বরং মানসিক ও প্রজননস্বাস্থ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। National institute of health (NIH) -এর তথ্যমতে, পূর্ণ বয়স্ক নারীদের জন্য সঠিক পুষ্টি ও সুষম খাদ্য গ্রহণ তাদের দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্য রক্ষা করতে এবং বিভিন্ন বয়সজনিত রোগ প্রতিরোধ করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। পূর্ণ বয়স্ক নারীদের ম্যাক্রো ও মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট-সমৃদ্ধ খাবার খাদ্যতালিকাতে রাখতে হবে।

একজন পূর্ণ বয়স্ক নারীর জীবনচক্রের কারণে কিছু বিশেষ উপাদানসমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ করতে হয়। এ সময় নারীদের শারীরিক কিছু পরিবর্তন আসে। যেমন—নারীর প্রেগন্যান্ট অবস্থা, স্তন্যদাত্রী অথবা মেনোপোজ চক্রেও থাকতে পারেন। তাই ম্যাক্রো আর মাইক্রোনিউট্রিশনসমৃদ্ধ খাবার প্রয়োজন। ভিটামিন ডি, ক্যালসিয়াম, ফলিক অ্যাসিড, ওমেগা ৩, ভিটামিন বি ১২ যেন তার খাবারে থাকে সেই দিকে লক্ষ রাখা দরকার।

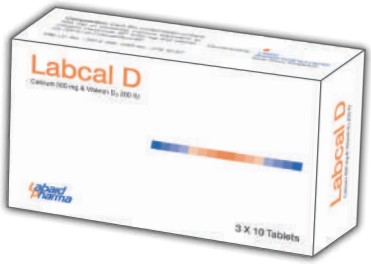

এভাবে শিশু, কিশোরী, পূর্ণ বয়স্ক নারী এই তিনটি ধাপে পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বিভিন্ন হলেও সবার ক্ষেত্রে সুষম ও সঠিক পুষ্টি অপরিহার্য। তাই নারীদের পুষ্টি নিশ্চিত করার মাধ্যমে তাদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা এবং সামগ্রিক জীবনের মান উন্নত করা সম্ভব। এই অনুচ্ছেদে বিভিন্ন বয়সে নারীদের পুষ্টিবিষয়ক বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হলো।

ইউনিসেফের তথ্যমতে, বিশ্বব্যাপী ১০০ কোটির বেশি কিশোরী ও নারী অপুষ্টি ও রক্ত স্বল্পতায় ভুগছে।

শিশু-কিশোরের ঘুমের সমস্যা

প্রফেসর ডা. এম এ মোহিত কামাল
এমবিবিএস, এম.ফিল. (সাইকি), এফসিপিএস (সাইকিয়াট্রি)
অধ্যাপক, সাইকোথেরাপি
সিনিয়র-চিফ কনসালট্যান্ট (সাইকিয়াট্রি অ্যান্ড সাইকোথেরাপি)
ল্যাবএইড কার্ডিয়াক হাসপাতাল
সাবেক প্রধান, সাইকোথেরাপি
প্রাক্তন একাডেমিক কোর্স ডিরেক্টর এমডি (সাইকিয়াট্রি)
সাবেক পরিচালক, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, ঢাকা

শিশুর ঘুমের সমস্যা নিয়ে অনেক মা-বাবাকে নির্ঘুম রাত কাটাতে হয়। কোনো কোনো নবজাতক কিংবা ছোট শিশু সহজে ঘুমিয়ে যায়। আবার কোনো কোনো শিশুর ক্ষেত্রে ঘুমের ঘাটতি দেখা যায়। ঘাটতি এতই চরমে পৌঁছায় যে, অস্থির হয়ে পড়েন মা-বাবা। অসহনীয় হয়ে ওঠে তাঁদের জীবনযাপন। কৈশোরে ঘুমের মাত্রা এত বেশি থাকে যে সন্তানকে সময়মতো স্কুলে পাঠাতে অভিভাবকেরা হিমশিম খেয়ে যান। ঢুলুঢুলু চোখে টিনএজাররা কিছু না খেয়েই ভোরে স্কুলের পথে পা বাড়ায়। আবার ব্যতিক্রমও রয়েছে।

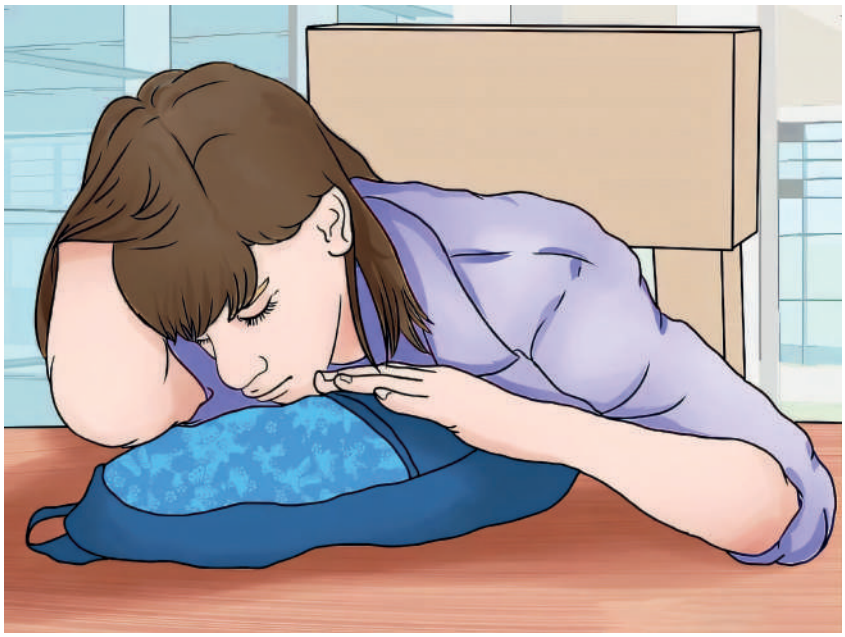

ঘুমের সমস্যার কারণে শিশু-কিশোরের আচরণে ঘটে বিরাট পরিবর্তন। কয়েকটি গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, অপর্যাপ্ত ঘুম টিনএজারদের মেজাজ, আচরণ ও পরীক্ষার রেজাল্টের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। বড়দের ওপর গবেষণায় দেখা গেছে, অনিদ্রার কারণে মস্তিষ্কের স্বাভাবিক কাজ বিঘ্নিত হয়, শিক্ষণ ও স্মরণশক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কগনিশনে বা চিন্তনের জট পাকায়, ধোঁয়াশার কারণে পরিচ্ছন্ন বাস্তব ধারণা তৈরি হতে পারে না। চিন্তনের সমস্যা থেকে দেখা দেয় দৈহিক ও মানসিক উপসর্গ। নবজাতক ও ইনফ্যান্সিতে ঘুমের মাত্রা বেশি থাকে, বয়সের ধাপে ধাপে কমে আসে ঘুমের মাত্রা।

কেন এমনটি হয়

এ নিয়েও গবেষণা হয়েছে প্রচুর। কয়েকটি গবেষণাপত্রের সারাংশ নিচে তুলে ধরা হলো :

আগের চেয়ে বর্তমানে ঘুমের সমস্যার ব্যাপকতা ও গভীরতা নিয়ে আরও বেশি জানা যাচ্ছে। শিশু-কিশোরদের ঘুমের সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতার হার

সাম্প্রতিক বিভিন্ন জরিপে দেখা গেছে, ১-৫ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে শতকরা ২৫ জন শিশু ঘুমের সমস্যায় ভোগে

অনেক বেশি। সমস্যার ব্যাপকতা আগের অভিজ্ঞতা ও ধারণাকে হার মানিয়েছে।

বলা হচ্ছে, অপর্যাপ্ত ঘুমের কারণে দিনের বেলায় আলস্য বেড়ে যায়, মনোযোগের অভাব দেখা দেয়, ঘুমজড়ানো কিংবা ঘুমকাতুরে ভাব বজায় থাকে। ফলে আচরণেও পরিবর্তন আসে, বিপর্যয় আসে। স্থায়ী ঘুমের সমস্যা বজায় থাকলে ইতিবাচক আবেগ সহজে জাগে না। কিছু ভালো লাগে না, বিরক্তি কিংবা নেতিবাচক আবেগের জালে জড়িয়ে কাটে দিন। রাতও হয়ে ওঠে অসহনীয়।

> “দীর্ঘদিনের ঘুমের সমস্যার কারণে শিশু-কিশোরের আচরণেও নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।”

প্রাণীর ওপর গবেষণায় দেখা গেছে, ঘুম কিংবা নির্ঘুমের কারণে ‘জিনের’ পরিবর্তন ঘটে। ফলে মস্তিষ্কে সার্কিট (Circuty) বিকাশে সমস্যা হয়।

মস্তিষ্কের যে অংশ ঘুম নিয়ন্ত্রণ করে, সেই অংশই মনোযোগ শাসন করে, ধরে রাখে। অতি দুরন্ত শিশু, যারা এডিএইচডি বা মনোযোগের ঘাটতিজনিত অতি সক্রিয় দুরন্তপনায় ভোগে, তাদের ঘুমের সমস্যা হয় বেশি।

ঘুমের সমস্যা থেকেই কি তৈরি হয় মনোযোগের ঘাটতি

বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। যথাযথ উত্তর পাওয়া না গেলেও ধারণা করা হচ্ছে, নির্ঘুম বা অপর্যাপ্ত ঘুমই প্রধানত এর জন্য দায়ী। কিন্তু মা-বাবাদের রিপোর্টের ভিত্তিতে বলা হয়েছে, এডিএইচডি রোগে শিশুদের ঘুমের সমস্যার আলাদা কোনো স্থায়ী ধরন পাওয়া যায়নি। এদেরও ঘুমের সূচনায় সমস্যা হয়। সহজে ঘুম আসে না কিংবা ঘুমের মধ্যে অস্থিরতা থাকে অথবা সারা রাত নির্ঘুম কাটিয়ে দেয় (ওয়েনস্ট, ২০০০)।

বয়ঃসন্ধিক্ষণে ঘুম

নতুনভাবে জানা যাচ্ছে, কৈশোরে হরমোন নিঃসরণের কারণে ঘুমের ওপর প্রভাব পড়ে। ঘুমের চক্রে পরিবর্তন আসে। দেরিতে ঘুম আসা, দেরিতে ওঠার প্রধান কারণ হচ্ছে, বয়ঃসন্ধিক্ষণে চক্রটির স্বাভাবিক ধারা বদলে যাওয়া। দেরিতে ঘুমালেও টিনএজারদের দেরিতে ওঠার সুযোগ নেই। ভোরবেলায় ঠেলেঠুলে মা-বাবা তুলে দেন। সর্বোচ্চ ৯ ঘণ্টায় পর্যাপ্ত ঘুম হয় না। দীর্ঘদিন এ ধরনের অবস্থা চলতে থাকলে টিনএজারদের আচরণ প্রভাবিত হয়, বিদ্যালয়ের দক্ষতা কমে যায়। এভাবে দীর্ঘদিনব্যাপী ঘুমের ওপর বাধা বা হামলা এলে শিশু-কিশোরের অ্যালার্টনেস বা সচেতন স্তরে বিপর্যয় নেমে আসে। ফলে জখম হয় মানসিকতা। মনোযোগের অভাব দেখা দেয়। আচরণ নিয়ন্ত্রণে সমস্যা হয়। দুর্বল হয়ে যায় স্মৃতিশক্তি। এ ধরনের পরিবর্তনের কারণে শিশুর পরীক্ষার রেজাল্ট খারাপ হয়। ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে কিংবা দৈহিক জখমের আশঙ্কা বেড়ে যায় (ডাহল, ২০০২)।

টিনএজারদের ঘুমের এ চক্রটির ব্যাপারে মা-বাবার জানা থাকা জরুরি। নিজেদের সচেতনতার মাধ্যমে সন্তানের বয়ঃসন্ধিক্ষণের এ ধরনের সমস্যা এবং বিপর্যয় রোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া সহজ হয় এবং ক্ষতির মাত্রা কমানো যায়।

৬-১২ বছর বয়সী শিশুদের প্রতিদিন ৯-১২ ঘন্টা এবং ১৩-১৮ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরীদের প্রতিদিন ৮-১০ ঘণ্টা ঘুমানো উচিত।

অনিয়মিত পিরিয়ডের কারণ, জটিলতা ও চিকিৎসা

অধ্যাপক ডা. কোররাতে আইনুল ফরহাদ (রোডিয়া)
এমবিবিএস, এফসিপিএস (অবস্ অ্যান্ড গাইনি)
ল্যাপারোস্কোপিক সার্জারিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত
স্ত্রীরোগ ও প্রসূতিবিদ্যা বিশেষজ্ঞ,
ল্যাবএইড ডায়াগনস্টিকস, গুলশান

পিরিয়ড বা মাসিক একজন নারীর জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও স্বাভাবিক বিষয়। পিরিয়ডের মাধ্যমেই একজন নারী সন্তান জন্মদানের সক্ষমতা লাভ করেন। সাধারণত, ৯ থেকে ১৩ বছরের মধ্যে একজন মেয়ের প্রথম পিরিয়ড শুরু হয় এবং প্রতি মাসে এটা নিয়মিত চলতে থাকে। কিন্তু, শরীরে ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরন হরমোনের তারতম্য ও নানা শারীরিক জটিলতার কারণে পিরিয়ড অনিয়মিত হতে পারে। অনিয়মিত পিরিয়ড নারীর প্রজনন স্বাস্থ্য ও স্বাভাবিক সুস্থতার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। সঠিক চিকিৎসা ও নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনের মাধ্যমে অনিয়মিত পিরিয়ডের সমস্যা সমাধান করা সম্ভব।

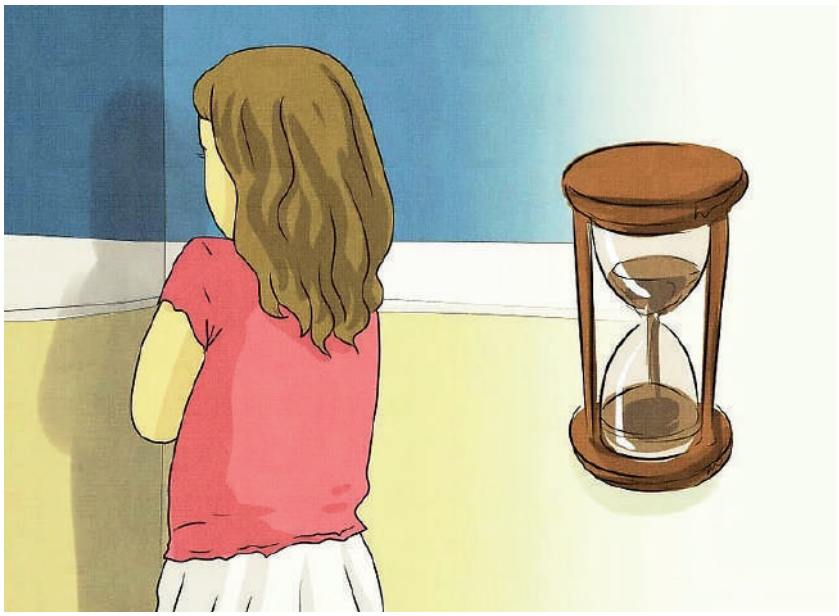

অনিয়মিত পিরিয়ড কী

পিরিয়ড সাধারণত ২৮ দিন পরপর হয়। কিন্তু শারীরিক অবস্থার তারতম্যের জন্য সব সময় একদম ২৮ দিন পরপর পিরিয়ড না-ও হতে পারে, কয়েক দিন আগে বা পরে হতে পারে, যা খুবই স্বাভাবিক। এক পিরিয়ড থেকে আরেক পিরিয়ড শুরু হওয়ার ব্যবধান সর্বনিম্ন ২১ ও সর্বোচ্চ ৩৫ দিন হতে পারে। কিন্তু কারো যদি ২১ দিনের আগে এবং ৩৫ দিনের পরে পিরিয়ড হয়, তাহলে সেটা হবে অনিয়মিত পিরিয়ড। পিরিয়ড অনিয়মিত হলে তলপেটে তীব্র ব্যথা, অতিরিক্ত রক্তপাত বা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক কম রক্তপাত, কখনো পরপর ২ বা ৩ মাস পিরিয়ড বন্ধ থাকার পর একটানা অনেকদিন পিরিয়ড চলা— এমন নানা উপসর্গ দেখা দিতে পারে।

অনিয়মিত পিরিয়ড কেন হয়

বয়ঃসন্ধিকালে অর্থাৎ পিরিয়ড শুরু হওয়ার প্রথম দিকে একজন নারীর অনিয়মিত পিরিয়ড হতে পারে। ঠিক একইভাবে, মেনোপজ শুরু হওয়ার আগে অনিয়মিত পিরিয়ড হয়। আবার যেসব নারী বাচ্চাকে বুকের দুধ

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের তথ্যমতে, বিশ্বব্যাপী শতকরা ১৪-২৫ জন নারী অনিয়মিত পিরিয়ডের সমস্যায় ভোগেন।

খাওয়ান তাঁদের পিরিয়ড বন্ধ থাকে বা অনিয়মিত পিরিয়ড হয়। এ ছাড়া বিভিন্ন শারীরিক জটিলতার কারণেও এই সমস্যা হয়। যেমন—

অতিরিক্ত মানসিক চাপ : মানসিক চাপ বা দুশ্চিন্তায় থাকলে প্রজনন হরমোনের নিঃসরণ কমে যায়। ফলে অনিয়মিত পিরিয়ড হয়।

ওজন কম বা বেশি : ওজন অতিরিক্ত কম বা বেশি হলে পিরিয়ডের ওপর প্রভাব পড়ে। ওজন অনেক বেশি হলে নারীদের ডিম্বাশয়ের চারপাশে চর্বি জমে ডিম্বাণু তৈরিতে সমস্যা হয়। যার ফলে পিরিয়ড নিয়মিত হয় না। আবার ওজন খুব কম হলেও পিরিয়ড অনিয়মিত হতে পারে।

অতিরিক্ত ব্যায়াম : অতিরিক্ত ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রম করলে ইস্ট্রোজেন হরমোনের মাত্রা কমে যায়। ফলে অনিয়মিত পিরিয়ড হয়।

পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম : মেয়েদের হরমোনজনিত একটি রোগ পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম বা পিসিওএস। এ রোগ হলে ডিম্বাশয়ের চারপাশে ছোট ছোট সিস্ট তৈরি হয়। ফলে, ডিম্বাণু তৈরি হওয়ার পরও ডিম্বাশয়ের বাইরে বের হতে পারে না। এর ফলে, ৩ বা ৪ মাস পরপর পিরিয়ড হয়; অনেক সময় হয়ই না। আবার পিরিয়ড হলে খুব বেশি রক্তপাত হয় এবং অনেক দিন থাকে।

থাইরয়েড : কোনো নারীর থাইরয়েড হরমোনজনিত সমস্যা হাইপোথাইরয়েডিজম বা হাইপারথাইরয়েডিজম থাকলে পিরিয়ড অনিয়মিত হয়।

জন্মনিয়ন্ত্রক ওষুধ : জন্মনিয়ন্ত্রক বিভিন্ন ওষুধ ও ইনজেকশন অনিয়মিত ব্যবহার করলে বা ব্যবহার করা হঠাৎ বন্ধ করে দিলে পিরিয়ড অনিয়মিত হতে পারে।

এন্ডোমেট্রিয়াল সিস্ট বা চকলেট সিস্ট : এন্ডোমেট্রিয়াল সিস্ট বা চকলেট সিস্ট হলে জরায়ুর বাইরের এন্ডোমেট্রিয়াল কোষগুলো ছিঁড়ে যায়। যার ফলে অতিরিক্ত রক্তপাত ও ঘন ঘন পিরিয়ড হয়। পিরিয়ডের সময় তলপেটে তীব্র ব্যথা হয়।

জরায়ু টিউমার : জরায়ুতে টিউমার হলে পিরিয়ড অনিয়মিত হয়ে পড়ে। ১৫ দিনের বেশি সময় ধরে পিরিয়ড চলতে পারে। পেটে তীব্র ব্যথা ও অতিরিক্ত রক্তপাত হয়।

অনিয়মিত পিরিয়ড হতে পারে নানা রোগের কারণ

যেসব নারীর অনিয়মিত পিরিয়ড হয়, তাঁরা নানা স্বাস্থ্যঝুঁকিতে থাকেন। যেমন—

গর্ভধারণে সমস্যা : পিরিয়ড নিয়মিত না হলে ডিম্বাশয়ে ডিম নিষিক্ত হওয়ার সঠিক সময় নির্ধারণ করা যায় না। ফলে, গর্ভধারণে সমস্যা হয়। অনেক সময় অপরিকল্পিত গর্ভধারণ হয়, যা মা ও বাচ্চা উভয়ের জন্যই ঝুঁকিপূর্ণ। অনিয়মিত পিরিয়ডের কারণে গর্ভকালীন বিভিন্ন জটিলতা যেমন— প্রিক্ল্যাম্পসিয়া, উচ্চ রক্তচাপ, প্রসবকালীন অধিক রক্তক্ষরণের ঝুঁকি বেড়ে যায়।

হৃদ্‌রোগ : পিরিয়ড অনিয়মিত হওয়ার অন্যতম কারণ পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম। এ রোগে আক্রান্ত হলে ওজন সহজে কমে না। ফলে, ধীরে ধীরে শরীরে কোলেস্টেরলের মাত্রা বৃদ্ধি পায় ও উচ্চ রক্তচাপ সৃষ্টি হয়, যা হৃদ্‌রোগের ঝুঁকি কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেয়।

ডায়াবেটিস : যেসব নারীর নিয়মিত পিরিয়ড হয় না, তাঁদের টাইপ-২ ডায়াবেটিস হওয়ার আশঙ্কা অনেক বেশি থাকে।

মানসিক বিষণ্নতা : পিরিয়ড অনিয়মিত হওয়ার অন্যতম কারণ শরীরে ইস্ট্রোজেন হরমোনের মাত্রা কমে যাওয়া। এ হরমোন কমে যাওয়ার প্রভাব মানসিক স্বাস্থ্যের ওপরও পড়ে। মানসিক উদ্বেগ ও বিষণ্নতা বৃদ্ধি পায়। মেজাজ খিটখিটে থাকে, কোনো কাজে মন বসে না। এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে পরিবার ও কর্মক্ষেত্রে।

অনিয়মিত পিরিয়ডের চিকিৎসা

অনিয়মিত পিরিয়ড কেন হচ্ছে, সেই কারণ অনুযায়ী এ রোগের চিকিৎসা করা হয়। পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম বা জরায়ুমুখে কোনো পলিপ হওয়ার কারণে পিরিয়ড অনিয়মিত হচ্ছে কি না, তা শনাক্তের জন্য জরায়ুর আলট্রাসনোগ্রাম করা হয়। পিসিওএস থাকলে ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরন হরমোন বৃদ্ধির ওষুধ দেওয়া হয়। চকলেট সিস্টের কোনো লক্ষণ থাকলে এন্ডোমেট্রিয়াল বায়োপসির মাধ্যমে তা শনাক্ত করা হয়। সিস্ট বেশি বড় হয়ে গেলে এবং ওষুধের মাধ্যমে না কমলে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয়। এ ছাড়া থাইরয়েড হরমোনের ভারসাম্যহীনতার কারণে পিরিয়ড অনিয়মিত হয়ে থাকলে হরমোন থেরাপি বা অ্যান্টি থাইরয়েড ড্রাগস দেওয়া হয়।

প্রতিরোধে করণীয়

অনিয়মিত পিরিয়ডের ঝুঁকি এড়াতে—

- প্রতিদিন পরিমিত ব্যায়াম করুন ও ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখুন।
- পুষ্টিকর খাবার খান।
- পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিন ও যথাসম্ভব মানসিক দুশ্চিন্তামুক্ত থাকুন।
- ধূমপান ও মদ্যপানের অভ্যাস থাকলে তা ত্যাগ করুন।
- জন্মনিরোধক ওষুধ সেবনে সচেতন হোন।

আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশনের তথ্য বলছে, যেসব নারীর পিরিয়ড অনিয়মিত হয় তাঁদের হৃদ্‌রোগের ঝুঁকি অন্যদের তুলনায় ১৯ শতাংশ বেশি।

Cephoral

Cefixime USP

200 mg
400 mg
Capsule

75 ml
50 ml DS
50 ml
37.5 ml
21 ml PD
Max 20 ml PD
DFS

A Preparation of DMF Grade Cefixime

An outstanding breakthrough with quality ingredients

- Ideal choice for switch therapy
- Most palatable suspension preparation
- Truly once or twice daily dose
- Pregnancy category B
- Safe from 6 months of age

labaid pharma Quality First...

Scan here to find our page instantly :
"Like" us on
facebook
fb.com/labaidpharmaceuticals

LABAID
PHARMACEUTICALS LIMITED
Bay Tower (Level-2), House 23, Gulshan-1, Dhaka-1212
Phone : 88 02 222299910, Fax : 88 02 9615497
info@labaidpharma.com, www.labaidpharma.com

*To be dispensed only by or on the prescription of a registered physician

ডা. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম (সোহান)
এমবিবিএস, ডিইএম, এমডি (এন্ডোক্রাইনোলজি, বারডেম)
ডায়াবেটিস, থাইরয়েড ও হরমোন বিশেষজ্ঞ
কনসালট্যান্ট, এন্ডোক্রাইনোলজি বিভাগ,
ল্যাবএইড স্পেশালাইজড হাসপাতাল

হরমোন সমস্যা : বিলম্বিত বয়ঃসন্ধি

বয়ঃসন্ধিকাল জীবনের এমন একটি পর্যায় যখন একজন ছেলে বা মেয়ে শিশুকাল থেকে কৈশোরকালে পদার্পণ করে। সাধারণত মেয়েদের ৮-১৩ বছর বয়সের মধ্যে বয়ঃসন্ধিকাল শুরু হয়। এ সময় একজন মেয়ের শরীরে প্রজনন হরমোন তৈরি হয়, পিরিয়ড শুরু হয় এবং স্তনের আকার পরিবর্তন হয়। অবশ্য শারীরিক অবস্থার তারতম্যের কারণে কিছুদিন আগে বা পরে কোনো মেয়ের বয়ঃসন্ধি শুরু হতে পারে, যা স্বাভাবিক। কিন্তু কারও যদি ১৩ বছর বয়সের পরও শারীরিক বিকাশ না ঘটে এবং ১৬ বছর বয়সেও পিরিয়ড শুরু না হয়, তাহলে বুঝতে হবে তার বয়ঃসন্ধি বিলম্বিত হচ্ছে। এ কারণে তার উচ্চতা স্বাভাবিকের চেয়ে কম হয়, হাড় বয়সের তুলনায় তেমন মজবুত হয় না এবং জরায়ু বিকশিত হয় না। ফলে মেয়েটিকে শারীরিক, মানসিক এমনকি সামাজিক নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। বিলম্বিত বয়ঃসন্ধির লক্ষণ প্রকাশ পেলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া জরুরি।

বিলম্বিত বয়ঃসন্ধির কারণ

দেরিতে বয়ঃসন্ধি শুরু হওয়ার বেশ কিছু কারণ রয়েছে। যেমন—

- কোনো পিতা-মাতার দেরিতে বয়ঃসন্ধি হলে তাঁদের সন্তানেরও বয়ঃসন্ধি বিলম্বিত হতে পারে।
- দীর্ঘমেয়াদি কোনো রোগ যেমন— ডায়াবেটিস, কিডনি রোগ, হাঁপানি, এবং অন্যান্য জন্মগত রোগ থাকলে বয়ঃসন্ধি বিলম্বিত হয়।
- টার্নার সিনড্রোমের মতো জিনগত রোগের কারণে বয়ঃসন্ধি ধীরে হয়।
- পিটুইটারি গ্রন্থিতে টিউমার বা হাইপোপিটুইটারিজম থাকলে পর্যাপ্ত ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরন হরমোন নিঃসৃত হয় না। ফলে বয়ঃসন্ধি বিলম্বিত হয়।
- থাইরয়েড হরমোনের ভারসাম্যহীনতার কারণে বিলম্বিত বয়ঃসন্ধি হতে পারে।
- দেহে সেক্স ক্রমোজোমের অস্বাভাবিকতার কারণে বয়ঃসন্ধি বিলম্বিত হয়।
- পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবারের অভাব দেরিতে বয়ঃসন্ধি হওয়ার অন্যতম কারণ।
- অতিরিক্ত ব্যায়াম বা একদমই ব্যায়াম না করলে সঠিক সময়ে বয়ঃসন্ধি না-ও হতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের তথ্য অনুযায়ী, শতকরা ৩০ জন মেয়ের বয়ঃসন্ধি বিলম্বিত হয় তাদের শারীরবৃত্তীয় সমস্যার কারণে।

- অতিরিক্ত ওজন বা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক কম ওজনের কারণে বয়ঃসন্ধি দেরিতে হতে পারে।
- অনেক সময় ক্যানসারের চিকিৎসা হিসেবে কেমোথেরাপি বা রেডিওথেরাপি দিলে ডিম্বাশয়ের ক্ষতি হয়। ফলে বয়ঃসন্ধি বিলম্বিত হয়।

বিলম্বিত বয়ঃসন্ধির প্রভাব

বয়ঃসন্ধি বিলম্বিত হলে এর প্রভাব পড়ে শরীর ও মনে। বিলম্বিত বয়ঃসন্ধির কারণে একটি মেয়ের হাড় ক্ষয় রোগ

হতে পারে। হ্রাস পেতে পারে তার সন্তান ধারণক্ষমতা। তা ছাড়া মেয়েটি যখন দেখে যে, তার বন্ধুরা তার তুলনায় দিন দিন বেড়ে উঠছে, তখন সে কষ্ট পায় ও মানসিক বিষণ্নতায় ভোগে। অনেক সময় সমাজে এমনকি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও তাকে হেয়প্রতিপন্ন হতে হয়। ফলে সে সবার থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখে এবং একাকিত্বে ভোগে। এ ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যদের উচিত হবে তাকে আশ্বস্ত করা এবং উৎসাহ দেওয়া। তাকে বোঝাতে হবে যে, সুচিকিৎসা ও সঠিক পদক্ষেপের মাধ্যমে বিলম্বিত বয়ঃসন্ধির সমস্যা সমাধান করা সম্ভব।

রোগনির্ণয় ও চিকিৎসা

কোনো মেয়ের বয়ঃসন্ধি কেন দেরিতে হচ্ছে, সে সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে তারপর চিকিৎসাব্যবস্থা নেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে কিছু শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা যেমন— এক্স-রে ও রক্তে হরমোনের মাত্রা পরীক্ষা করা জরুরি। পাশাপাশি গোনাডোট্রপিন ও সেক্স হরমোনের সঙ্গে জরায়ু ও ডিম্বাশয়ের আলট্রাসনোগ্রাম করার প্রয়োজন হতে পারে। এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে মেয়েটির শারীরিক বৃদ্ধির হার, হাড়ের গঠন ও বয়স এবং হরমোনের মাত্রা দেখে চিকিৎসাব্যবস্থা নেওয়া হয়। হরমোনজনিত সমস্যার কারণে বয়ঃসন্ধি বিলম্বিত হলে ইস্ট্রোজেন হরমোন থেরাপি দেওয়া হয়। এটি ১০-১১ বছর বয়সের মধ্যে দিলে ভালো হয়। ৩ মাসের জন্য সাময়িক এ থেরাপি দিলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সফলতা পাওয়া যায়। এ ছাড়া শরীরে জন্মগত বা দীর্ঘমেয়াদি কোনো রোগ কিংবা মানসিক সমস্যা থাকলে দ্রুত প্রয়োজনীয় চিকিৎসাব্যবস্থা নিতে হবে। অপুষ্টি ও শরীরে নির্দিষ্ট কোনো ভিটামিনের অভাব থাকলে তা পূরণ করতে হবে। পাশাপাশি পর্যাপ্ত ঘুম, সুষম ও স্বাস্থ্যকর খাবার এবং কাজকর্মে সক্রিয় থাকা জরুরি। আর যদি পরীক্ষা-নিরীক্ষায় শারীরিক কোনো সমস্যা ধরা না পড়ে তাহলে বুঝতে হবে জিনগত কারণে বয়ঃসন্ধি দেরিতে হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে আতঙ্কিত না হয়ে অপেক্ষা করুন। কিছুদিন পর আপনাআপনিই বয়ঃসন্ধি শুরু হবে।

গবেষণায় দেখা গেছে, পারফ্লুরোঅ্যালকাইল ও পলিফ্লুরোঅ্যালকাইল এর মতো রাসায়নিক পদার্থযুক্ত খাদ্য হরমোন উৎপাদন ব্যাহত করে এবং বয়ঃসন্ধি বিলম্বিত করে।

মেয়েদের অবাঞ্ছিত লোম : অপসারণে লেজার ট্রিটমেন্ট

ডা. ফারিবা মজিদ
এমবিবিএস (ঢাকা মেডিকেল কলেজ)
এমসিপিএস, এফসিপিএস (চর্ম ও যৌন রোগ)
অ্যাডভান্স ট্রেনিং অন এস্থেটিক ডার্মাটোলজি (ডিডিআই)
চর্ম, যৌন, এলার্জি, কুষ্ঠ, লেজার ও কসমেটিক সার্জন
কনসালট্যান্ট, ল্যাবএইড লেজার অ্যান্ড এস্থেটিক লাউঞ্জ

আমাদের প্রত্যেকের শরীরেই কমবেশি লোম আছে। কিন্তু নারী-পুরুষভেদে লোমের ধরন ভিন্ন হয়। নারীদের দেহে অনেক পাতলা ও হালকা লোম থাকে। পুরুষদের থাকে ঘন, কালো লোম। কিন্তু, যদি এর বিপরীত হয় অর্থাৎ কোনো মেয়ের শরীরে যদি ছেলেদের মতো ঠোঁটের ওপরে ও থুতনিতে, গালের দুই পাশে, বুকে, পিঠে, পেটে ও উরুতে অপ্রয়োজনীয় লোম গজায় তাহলে তা খুবই অস্বস্তিকর ও চিন্তার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। মেয়েটিকে পরিবার ও সমাজে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়তে হয়। এতে সে মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং নিজেকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করে। কখনো চেষ্টা করে নিজে নিজে লোমগুলো কেটে ফেলার। এতে সমস্যার সমাধান না হয়ে উল্টো আরও বেড়ে যায়। সঠিক সময়ে চিকিৎসকের পরামর্শে কার্যকর চিকিৎসার মাধ্যমে অবাঞ্ছিত লোম অপসারণ করা সম্ভব। অবাঞ্ছিত লোমের সমস্যাকে 'হারসুটিজম' বলা হয়।

অবাঞ্ছিত লোম কেন হয়

সাধারণত, হরমোনজনিত সমস্যায় মেয়েদের শরীরে অবাঞ্ছিত লোম হয়। এন্ড্রোজেন নামক হরমোন মেয়েদের শরীরে খুব কম পরিমাণে থাকে। পুরুষদের বেশি থাকে। কিন্তু কোনো কারণে মেয়েদের দেহে এ হরমোনের পরিমাণ বেড়ে গেলে অতিরিক্ত লোম গজায়; কণ্ঠ ভারী হয়ে যায়। এ ছাড়া, আরও বিভিন্ন কারণে অবাঞ্ছিত লোমের সমস্যা হতে পারে। যেমন—

- পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম বা পিসিওএস রোগে মেয়েদের শরীরে পুরুষ হরমোন টেস্টোস্টেরনের পরিমাণ বেড়ে যায়। ফলে শরীরে অতিরিক্ত লোম গজায়, ওজন বৃদ্ধি পায় ও গর্ভধারণে সমস্যা হয়।
- পিটুইটারি গ্রন্থি বা এড্রেনাল গ্রন্থিতে যদি টিউমার বা সিস্ট হয় তাহলে এন্ড্রোজেন হরমোন বেড়ে গিয়ে অবাঞ্ছিত লোম হয়।
- শরীরে স্ট্রেস হরমোন বা কর্টিসলের মাত্রা বৃদ্ধি পেলে অবাঞ্ছিত লোমের সমস্যা হতে পারে।
- থাইরয়েড বা অন্য কোনো হরমোনজনিত সমস্যাহরমোন প্রতিস্থাপন থেরাপি

গবেষণা অনুযায়ী, ১৫-৪৫ বছর বয়সী নারীদের মধ্যে শতকরা ৫-১০ জন হারসুটিজম বা অবাঞ্ছিত লোমের সমস্যায় ভোগেন।

নিলে শরীরে অতিরিক্ত লোম দেখা দিতে পারে।

- জন্মনিরোধক ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে অবাঞ্ছিত লোম হতে পারে।
- স্টেরয়েডজাতীয় ওষুধ ও রং ফর্সাকারী বিভিন্ন ক্রিম ব্যবহার করলে অবাঞ্ছিত লোমের সমস্যা হয়।
- নারীদের মেনোপজের পর শরীরের হরমোন পরিবর্তন হয়ে যায়। তখন অতিরিক্ত লোমের সমস্যা দেখা দিতে পারে।
- অনেক সময় বংশগতভাবেও শরীরে অতিরিক্ত লোম থাকে।

অবাঞ্ছিত লোম অপসারণে লেজার চিকিৎসা

অতিরিক্ত লোম অপসারণে অনেকে ব্লিচ, শেভিং, ওয়াক্সিং ও থ্রেডিং করেন। কেউ কেউ বিভিন্ন রকমের ক্রিমও ব্যবহার করে থাকেন। তবে অবাঞ্ছিত লোম অপসারণে সবচেয়ে অত্যাধুনিক চিকিৎসাপদ্ধতি হলো লেজার।
লেজার চিকিৎসায় লেজার রশ্মির সাহায্যে আলোর একটি নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্য ব্যবহার করে ত্বকের গভীরে আলোর বিম প্রয়োগ করা হয়। এতে লোমের গোড়ায় যে লোমবৃদ্ধিকারী স্টেম সেল বা কোষগুলো থাকে, তা ধীরে ধীরে ধ্বংস হয়ে যায়। এটি চুলের ফলিকল ও ভালভকেও নিষ্ক্রিয় করে দেয়। ফলে লোমের বৃদ্ধি অনেকাংশেই কমে যায়।

যে ধরনের ত্বক ও চুলে লেজার সবচেয়ে ভালো কাজ করে

আমাদের শরীরে দুই ধরনের মেলানিন থাকে— ইউমেলানিন ও ফিমেলানিন। মেলানিন আমাদের ত্বক ও চুলের রং নির্ধারণ করে। ইউমেলানিনের জন্য চুলের রং কালো বা বাদামি হয়ে থাকে। ফিমেলানিনের জন্য রং হয় সাদা বা লালচে। ইউমেলানিনে অর্থাৎ চুলের রং যদি কালো বা বাদামি হয় তাহলে লেজার পদ্ধতি সবচেয়ে ভালো কাজ করে। তাছাড়া, শুষ্ক, তৈলাক্ত বা মিশ্র যেকোনো ধরনের ত্বকেই লেজার প্রয়োগ করা যায়। তবে অতিসংবেদনশীল ত্বকে লেজার রশ্মি প্রয়োগ করলে একটু ব্যথা ও লালচে ভাব হতে পারে, যা অল্পদিনেই ঠিক হয়ে যায়।

লেজার চিকিৎসার মাধ্যমে কি অবাঞ্ছিত লোম স্থায়ীভাবে দূর করা যায়

লেজার একটি ব্যথামুক্ত ও স্থায়ী চিকিৎসাপদ্ধতি। ওয়াক্সিং অথবা থ্রেডিং প্রতি মাসেই করাতে হয়। কিন্তু লোমের ধরন ও বৃদ্ধি অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট সময় পরপর কয়েকবার লেজার চিকিৎসা নিলে অবাঞ্ছিত লোমের সমস্যা স্থায়ীভাবে সমাধান করা সম্ভব।

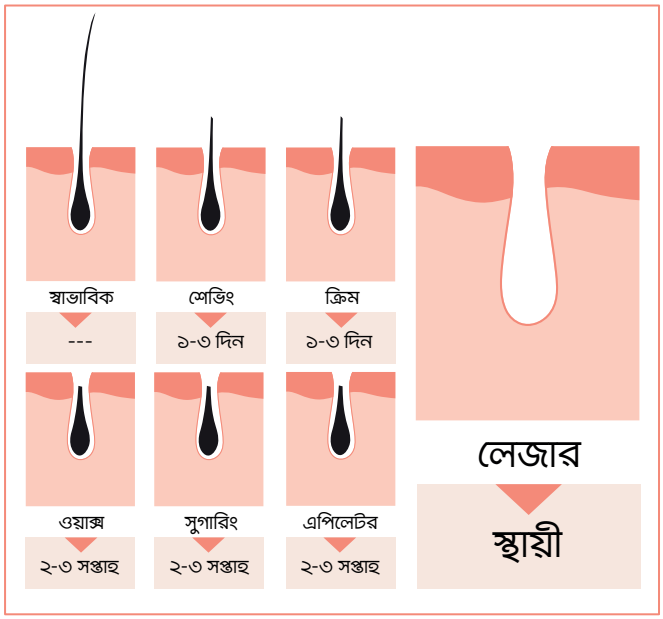

লেজার চিকিৎসার সুবিধা

- এই পদ্ধতিতে ত্বকের কোনো ক্ষতি হয় না।
- কোনো রকম কাঁটাছেড়ার প্রয়োজন হয় না।
- ত্বকের গভীর থেকে লোমের বৃদ্ধি প্রতিরোধ করে।
- চিকিৎসার পর ত্বকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়।

সতর্কতা

লেজার চিকিৎসা নেওয়ার আগে কিছু বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি। যেমন—

- লেজার চিকিৎসার অন্তত ৬ সপ্তাহ আগে থেকে ওয়াক্সিং ও থ্রেডিং করা যাবে না।
- সূর্যরশ্মি এড়িয়ে চলতে হবে।
- বাইরে গেলে অবশ্যই সানস্ক্রিন ব্যবহার করতে হবে।
- শরীরের যে স্থানে লেজার চিকিৎসা দেওয়া হবে, সে স্থানে ট্যাটু করা যাবে না।
- লেজার অবশ্যই একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে করতে হবে।
- একজিমা বা অন্য কোনো চর্মরোগ থাকলে লেজার না করানোই ভালো।
- গর্ভাবস্থায় লেজার চিকিৎসা নেওয়া যাবে না।

অবাঞ্ছিত লোম অপসারণে লেজার চিকিৎসার জন্য বাংলাদেশের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠানগুলোর অন্যতম– ল্যাবএইড লেজার অ্যান্ড এস্থেটিক লাউঞ্জ।

কিশোরীদের যত টিকা

ডা. শারমিন আফরোজ
এমবিবিএস, এমসিপিএস (গাইনি অ্যান্ড অবস্)
প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ও ল্যাপারোস্কোপিক ট্রেইনিং ইন ল্যাপারোস্কোপি (ইন্ডিয়া)
হিস্টেরোস্কপি, বন্ধ্যাত্ব গর্ভকালীন ডায়াবেটিস ও হরমোনের সমস্যা এবং স্তনের সমস্যায় অভিজ্ঞ,
ল্যাবএইড ডায়াগনস্টিকস, মিরপুর

কোনো রোগ হওয়ার পরে আমরা চিকিৎসার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠি। কিন্তু চিকিৎসা পর্যন্ত যেতেই হবে না যদি আমরা আগে থেকেই সেই রোগ প্রতিরোধ করার শক্তি অর্জন করি। আর যেকোনো সংক্রামক রোগ প্রতিরোধের সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি হলো— টিকা বা ভ্যাকসিন। টিকা আমাদের শরীরে অ্যান্টিবডি তৈরির মাধ্যমে রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুকে নিষ্ক্রিয় করে রাখে। আমাদের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বৃদ্ধি করে। নবজাতক শিশু, গর্ভবতী মায়ের পাশাপাশি কিশোরীস্বাস্থ্যে টিকার কোনো বিকল্প নেই। আজ যে কিশোরী, ভবিষ্যতে সেই হবে মা। তাকে সুরক্ষিত রাখা এবং তার শরীরে রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরি। না হলে একদিন দেখা যাবে, সে বিভিন্ন সংক্রামক রোগে ভুগছে বা বিকলাঙ্গ শিশু জন্ম দিচ্ছে। তাই, কিশোরীর স্বাস্থ্য সুরক্ষায় টিকা দেওয়ার ব্যাপারে সর্বোচ্চ সচেতনতা জরুরি।

কিশোরীদের যেসব টিকা দেওয়া হয়

টিটেনাস টক্সয়েড

ক্লোস্ট্রিডিয়াম টিটানি নামের একধরনের ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ থেকে টিটেনাস বা ধনুষ্টংকার রোগ হয়। শরীরের কোনো অংশে কেটে গেলে সেই কাটা অংশ দিয়ে এই ব্যাকটেরিয়া শরীরে প্রবেশ করে এবং টিটানু স্পাসমিন নামক জীবাণু তৈরি করে। জীবাণুটি স্নায়ুতন্ত্রকে আক্রান্ত করে। ফলে শরীরে খিঁচুনি শুরু হয়। সময়মতো চিকিৎসা না করালে রোগীর মৃত্যুও হতে পারে। টিটেনাসের সংক্রমণ রোধ করতে টিটেনাস টক্সয়েড ভ্যাকসিন দেওয়া হয়। ১৫-৪৯ বছর বয়সের মধ্যে সকল মেয়ের টিটি টিকা নেওয়া বাধ্যতামূলক। টিটি টিকা মোট ৫ বার দেওয়া হয়।

টিটি ১ম ডোজ : ১৫ বছর পূর্ণ হওয়ার পর।
টিটি ২য় ডোজ : ১ম ডোজ দেওয়ার ৪ সপ্তাহ পর।
টিটি ৩য় ডোজ : ২য় ডোজ দেওয়ার ৬ মাস পর।
টিটি ৪র্থ ডোজ : ৩য় ডোজ দেওয়ার ১ বছর পর।

আধুনিক বিশ্বের প্রথম সফল টিকা হলো– গুটিবসন্তের টিকা, যা ইংরেজ চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিক এডওয়ার্ড জেনার আবিষ্কার করেন।

টিটি ৫ম ডোজ : ৪র্থ ডোজ দেওয়ার ১ বছর পর।

টিটেনাস টিকা একই সঙ্গে টিটেনাস, ডিফথেরিয়া ও পারটুসিস বা হুপিং কাশি (Tdap) প্রতিরোধে কার্যকর।

এমআর

হাম ও রুবেলা প্রতিরোধী টিকা এমআর। হাম ভাইরাসজনিত মারাত্মক একটি সংক্রামক রোগ। হাম হলে খিঁচুনি, ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া এমনকি মস্তিষ্কে প্রদাহের মতো জটিলতা দেখা দিতে পারে। অন্যদিকে, রুবেলাও ভাইরাসজনিত মারাত্মক একটি রোগ। গর্ভাবস্থার ৩ মাসের মধ্যে কোনো নারী যদি রুবেলা ভাইরাসে আক্রান্ত হন তাহলে তাঁর গর্ভপাত হতে পারে, গর্ভের শিশু বিকলাঙ্গ হতে পারে এবং শিশু জন্মগত হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এ জন্য বিয়ের আগেই একজন মেয়ের হাম ও রুবেলা প্রতিরোধী ভ্যাকসিন নেওয়া জরুরি। ১৫ বছর বয়সে ১ম ডোজ টিটেনাস টিকার সাথে ১ ডোজ এমআর টিকা দেওয়া হয়। পরে আরও ১ ডোজ এমআর টিকা নেওয়া লাগতে পারে।

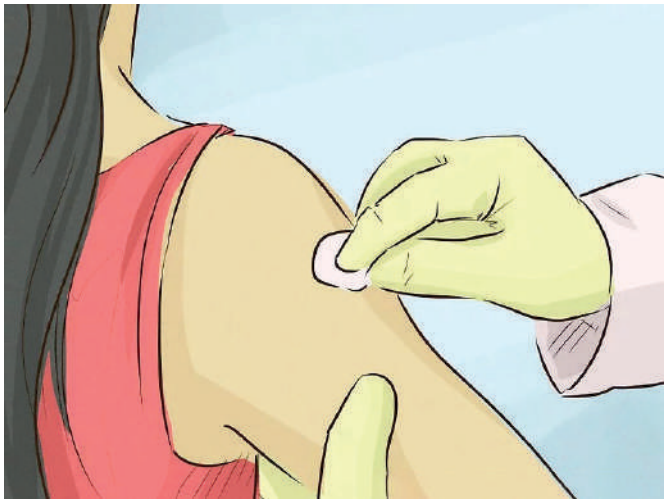

এইচপিভি (হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস)

হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস (এইচপিভি) খুবই ছোঁয়াচে একটি ভাইরাস। সাধারণত, অনিরাপদ যৌন মিলনের মাধ্যমে এ ভাইরাস ছড়ায়। এটির সংক্রমণে শরীরের যেকোনো অংশে বিশেষ করে যৌনাঙ্গে আঁচিল, মেয়েদের জরায়ুমুখে ক্যানসার, কণ্ঠনালি ও জিহ্বায় ক্যানসার হয়। এইচপিভি ভাইরাসের কোনো ওষুধ এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তবে এর টিকা রয়েছে, যা এই ভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট রোগ প্রতিরোধে কার্যকর। জরায়ু ক্যানসারে আক্রান্তের হার প্রায় ৯০ শতাংশ কমানো সম্ভব হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস বা এইচপিভি টিকার মাধ্যমে। ১০ বছর বয়স থেকে মেয়েদের এই টিকা দেওয়া হয়।

১ম ডোজ : ১০-১৫ বছর বয়সে।

২য় ডোজ : ১ম ডোজ দেওয়ার ৬ মাস বা ১ বছরের মধ্যে।

১৫ বছর বয়সের পরে টিকা নিলে ৩ ডোজ টিকা নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে ১ম টিকা দেওয়ার ১-২ মাসের মধ্যে ২য় টিকা এবং পরবর্তী ৬ মাসের মধ্যে ৩য় টিকা নিতে হবে। এইচপিভি টিকা সাধারণত ১০-২৬ বছর বয়স পর্যন্ত দেওয়া হয়। ২৬ বছরের পরে টিকা নেওয়ার প্রয়োজন হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

> “ নবজাতক, কিশোরী ও গর্ভবতী মায়ের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় টিকার কোনো বিকল্প নেই। ”

মেনিনগোকক্কাল ভ্যাকসিন

মেরুদণ্ড ও মস্তিষ্কের আবরণ মেনিনজেসের প্রদাহজনিত সংক্রামক রোগ মেনিনজাইটিস। আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচি-কাশি থেকে এ রোগ ছড়ায়। শিশু ও ১৬-২৩ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরীদের এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি। মেনিনগোকক্কাল ভ্যাকসিন গ্রুপ-এ, সি, ডব্লিউ-১৩৫ এবং ওয়াই মেনিনজাইটিস প্রতিরোধের সবচেয়ে ভালো উপায়। কিশোরীদের মেনিনগোকক্কাল এসিডব্লিউওয়াই (Men ACWY) টিকার ২টি ডোজ প্রয়োজন।

- প্রথম ডোজ : ১১ বা ১২ বছর বয়সে।
- দ্বিতীয় (বুস্টার) ডোজ : ১৬ বছর বয়সে।

ফ্লু ভ্যাকসিন

শ্বাসতন্ত্রে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের সংক্রমণে ফ্লু বা ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়। ফ্লু হলে জ্বর, সর্দি, কাশি, মাথাব্যথা, বমি, ডায়রিয়া এমনকি নিউমোনিয়ার মতো স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দেয়। ফ্লু প্রতিরোধের সবচেয়ে ভালো উপায় হলো— প্রতিবছর ফ্লু ভ্যাকসিন নেওয়া। ৬ মাস বয়সের পর থেকেই এই ভ্যাকসিন দেওয়া যায়। কিশোরী মেয়ে যাদের শ্বাসকষ্ট ও হৃৎপিণ্ডের কোনো রোগ রয়েছে এবং দীর্ঘদিন অ্যাসপিরিন থেরাপি নিচ্ছে, তাদের প্রতিবছর ফ্লু ভ্যাকসিন নেওয়া উচিত।

হেপাটাইটিস-বি

হেপাটাইটিস-বি ভাইরাসের সংক্রমণে লিভার ক্যানসার ও লিভার সিরোসিসের মতো মারাত্মক রোগ হয়। কোনো নারীর শরীরে হেপাটাইটিস-বি ভাইরাস থাকলে পরে তাঁর সন্তানও এ ভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারে। কাজেই গর্ভধারণের আগেই একজন মেয়ের হেপাটাইটিস-বি ভাইরাসের টিকা গ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। ১৮ বছরের বেশি বয়সী সকল নারী হেপাটাইটিস-বি ভাইরাস টিকা গ্রহণ করতে পারবেন। এই টিকার মোট ৩টি ডোজ দেওয়া হয়। ১ম বার টিকা নেওয়ার ১ মাস পরে ২য় ডোজ ও তার পরবর্তী ৬ মাস পরে ৩য় ডোজ টিকা নিতে হবে।

২০২৩ সালের অক্টোবর মাসে বাংলাদেশে ১ কোটিরও বেশি মেয়েকে বিনা মূল্যে টিকা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

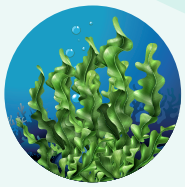

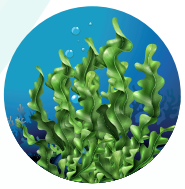

To meet standard calcium
Algita D
Tablet
Calcium (Algae source) 500 mg & Vitamin D3 200 IU
Truly Pure & Active plant based Calcium
&
To meet extra calcium
Algita DX
Tablet
Calcium (Algae source) 600 mg & Vitamin D3 400 IU
Extra Natural Calcium, Extra Care
API from USFDA Approved Source Calcium
+
Vitamin D3 FROM DENMARK
=
Premium Quality Product
100% natural & plant source Calcium
Highest absorption rate (97%)
Contains 74 trace minerals
Does not cause Kidney stone, Myocardial Infarction or Constipation like side effects
Increases HDL level
Algita D
Algita DX
3 X 10 Tablets
*To be dispensed only by or on the prescription of a registered physician
Labaid Pharma Quality First...
Scan here to find our page instantly :
"Like" us on facebook
fb.com/labaidpharmaceuticals
LABAID
PHARMACEUTICALS LIMITED
Bay Tower (Level 2), House 23, Gulshan 1, Dhaka-1212
Phone : 88 02 222299910, Fax : 88 02 9615497
info@labaidpharma.com, www.labaidpharma.com

গর্ভকালীন স্বাস্থ্যযত্ন : সুরক্ষায় করণীয়

অধ্যাপক ডা. আফজালুন্নেসা চৌধুরী
এমবিবিএস, ডিজিও, এমসিপিএস,
এফসিপিএস (অবস অ্যান্ড গাইনি)
ট্রেইন্ড ইন এ্যাডভান্সড কলনোস্কোপি এন্ড ল্যাপারোস্কোপি
প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ও ল্যাপারোস্কোপিক সার্জন
প্রাক্তন অধ্যাপক,
শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল
সিনিয়র কনসালট্যান্ট, ল্যাবএইড স্পেশালাইজড হাসপাতাল

সন্তান জন্মদান একজন নারীর জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও আনন্দময় মুহূর্ত। প্রত্যেক গর্ভবতী নারী চান একটি সুস্থ ও স্বাভাবিক সন্তান প্রসব করতে। এ জন্য গর্ভবতী মা ও তাঁর অনাগত সন্তানের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় গর্ভকালীন যত্ন অপরিহার্য। গর্ভবতী মায়ের নিয়মিত স্বাস্থ্যপরীক্ষা, পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ, শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা নিশ্চিত করা এবং গর্ভকালীন ঝুঁকিসমূহ প্রতিরোধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যদের সহযোগিতার পাশাপাশি নিজে সচেতন হওয়া জরুরি।

গর্ভাবস্থায় নারীর শারীরিক ও মানসিক জটিলতা

গর্ভবতী নারী বিভিন্ন শারীরিক ও মানসিক সমস্যায় ভুগে থাকেন। এই সময় শরীর কখনো সুস্থ থাকে, কখনো অসুস্থ। মনও থাকে বিষণ্ন। গর্ভাবস্থায় একজন নারীর শরীরে যেসব পরিবর্তন দেখা যায়—

- ওজন বেড়ে যায়। বমি বমি ভাব হয়; বিশেষ করে সকালের দিকে।
- স্তনের আকার পরিবর্তন হয় ও স্তনের চারপাশ কালো হয়ে যায়।
- রক্তে শর্করার পরিমাণ বেড়ে গিয়ে ডায়াবেটিস হওয়ার আশঙ্কা থাকে।
- পেট ভারী হয়ে যায়।
- অনেকের উচ্চ রক্তচাপ হয়ে থাকে।
- জরায়ুর আকার বড় হয়ে যায়। ফলে মূত্রথলিতে চাপ পড়ে ও বারবার প্রস্রাব হয়।
- রক্তশূন্যতা হওয়ার আশঙ্কা থাকে।
- পায়ে পানি জমে পা ফুলে যায়।
- খিঁচুনির ঝুঁকি বেড়ে যায়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গবেষণা অনুযায়ী, বিশ্বব্যাপী শতকরা ৩৭ জন নারী গর্ভকালীন রক্তশূন্যতায় ভোগেন।

এ ছাড়া, হরমোনজনিত সমস্যায় একজন গর্ভবতী নারী বেশির ভাগ সময়ই মানসিক বিষণ্নতায় ভুগে থাকেন। মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায় ও কাজকর্মে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। মানসিক অস্থিরতা অনুভব করেন, কান্নাকাটি করেন এমনকি আত্মহত্যার চিন্তাও করে থাকেন। সাধারণত, এই সমস্যাগুলো বেশির ভাগ গর্ভবতী নারীরই হয়ে থাকে। কিন্তু গর্ভাবস্থায় কোনো নারীর যদি যোনিপথে রক্তপাত ও ব্যথা, খিঁচুনি, তীব্র মাথাব্যথা ও চোখে ঝাপসা দেখা, অতিরিক্ত বমি ও একদমই খেতে না পারা, বুকব্যথা বা বুক ধড়ফড় করা, শরীরে পানি জমে শরীর ফুলে যাওয়া, অতিরিক্ত ক্লান্তি— এসব জটিলতা দেখা যায় তাহলে দেরি না করে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে এবং সমস্যা প্রতিরোধে ব্যবস্থা নিতে হবে।

নিরাপদ মাতৃত্বের জন্য গর্ভবতী নারীর সঠিক পরিচর্যা

সুস্থ সন্তান জন্মদানের জন্য গর্ভবতী মায়ের সুস্থতা জরুরি। এ জন্য গর্ভাবস্থায় নারীর চাই সঠিক পরিচর্যা। এ জন্য কিছু বিষয় মেনে চলতে হবে।

গর্ভকালীন স্বাস্থ্য পরীক্ষা

গর্ভাবস্থায় প্রত্যেক নারীর কমপক্ষে ৪ বার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো উচিত। এতে মা ও গর্ভের শিশুর শারীরিক জটিলতায় আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকলে আগে থেকেই ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। গর্ভবতী মাকে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। এ জন্য নির্দিষ্ট সময় পরপর ওজন পরিমাপ করতে হবে। গর্ভাবস্থায় করা যায়, এমন ব্যায়াম করা যেতে পারে। রক্তচাপ, ডায়াবেটিস ও কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখা জরুরি।

রক্তশূন্যতা আছে কি না, রক্তে ডায়াবেটিস, হেপাটাইটিস-বি ও সিফিলিসের উপস্থিতি আছে কি না, তা জানার জন্য নিয়মিত রক্ত পরীক্ষা করতে হবে। গর্ভাবস্থায় ৩ বার আলট্রাসনোগ্রাম করা উচিত। এই পরীক্ষার মাধ্যমে জরায়ুতে সঠিকভাবে গর্ভধারণ হয়েছে কি না, শিশুর শারীরিক বিকাশের হার, শিশুর কোনো শারীরিক ত্রুটি আছে কি না, গর্ভফুল ও গর্ভের শিশুর অবস্থান, একের অধিক বাচ্চা আছে কি না, বাচ্চা প্রসবের সম্ভাব্য তারিখ মাসিকের তারিখের সঙ্গে সংগতি আছে কি না সে সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। গর্ভবতী মাকে লিভার, কিডনি, হৃৎপিণ্ড ও থাইরয়েড পরীক্ষা করতে হবে। এ ছাড়া গর্ভাবস্থার ৪ থেকে ৮ মাসের মধ্যে ২ ডোজ টিটি টিকা দিতে হবে। তবে আগে থেকেই টিটি টিকার পূর্ণ ডোজ নেওয়া থাকলে আর টিকা দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

গর্ভবতী নারীর খাদ্য হতে হবে সুষম ও পুষ্টিকর

গর্ভবতী মায়ের স্বাস্থ্য জটিলতা প্রতিরোধে ও গর্ভের শিশুর গঠন ও বিকাশে সুষম খাবার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিদিনই পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে। গর্ভাবস্থায় অনেকেরই অরুচি হয়। এ ক্ষেত্রে অল্প অল্প করে কয়েকবার খাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে ওজন যেন বেড়ে না যায়। অতিরিক্ত তেল, চর্বি ও চিনিযুক্ত খাবার না খাওয়াই ভালো। এতে ওজন বেড়ে যাওয়ার পাশাপাশি হার্টের নানা রোগ ও ডায়াবেটিস হতে পারে। এড়িয়ে চলতে হবে প্রক্রিয়াজাত খাবার ও অ্যালকোহলজাতীয় পানীয়। অ্যালার্জি হয় এমন খাবার পুরোপুরি বাদ দিতে হবে। শর্করাজাতীয় খাবার, দুধ, সবুজ শাকসবজি, ফলমূল ও প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার রাখতে হবে খাদ্যতালিকায়। ত্বক, রক্তনালি ও হাড় সুস্থ রাখতে ভিটামিন সি ও ভিটামিন ডি খেতে হবে। পর্যাপ্ত পানি পান করতে হবে। গর্ভাবস্থার বিভিন্ন পর্যায়ে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ফলিক অ্যাসিড ট্যাবলেট, আয়রন ট্যাবলেট ও ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট খাওয়া উচিত। গর্ভবতী মায়ের খাবার রান্নার সময়ও বাড়তি সতর্কতা জরুরি। রান্না করার পাত্র ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিতে হবে। মাছ, মাংস, শাকসবজি রান্নার আগে ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হবে। খাবার ভালোভাবে সেদ্ধ করে রান্না করা উচিত। সব সময় চেষ্টা করতে হবে টাটকা খাবার খাওয়ার। ফ্রিজে বেশি দিন সংরক্ষিত খাবার না খাওয়ায় ভালো।

গর্ভাবস্থায় চাই সঠিক পারিবারিক যত্ন

গর্ভবতী নারীর প্রতি পারিবারিক সচেতনতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গর্ভবতী মাকে সময় দেওয়া, তাঁকে আত্মবিশ্বাসী হতে সাহায্য করা পরিবারের দায়িত্ব। এ জন্য পরিবারের সদস্যদের উচিত গর্ভবতী মাকে—

- হাসি-খুশি রাখা।
- পর্যাপ্ত বিশ্রামের সুযোগ করে দেওয়া।
- মানসিক চাপমুক্ত রাখা।
- পুষ্টিকর ও সুষম খাবার নিশ্চিত করা।
- ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে এমন কোনো কাজ থেকে বিরত রাখা।
- মানসিকভাবে প্রস্তুত রাখা।
- অসুস্থ হলে দ্রুত চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া।

নারীর গর্ভকালীন যত্ন মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যু রোধ করতে পারে। তাই গর্ভাবস্থায় নারীর স্বাস্থ্য সুরক্ষার কোনো বিকল্প নেই।

গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে শতকরা মাত্র ৩৬ জন নারী গর্ভাবস্থায় চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে থাকেন।

Zeofit-CI

Carbonyl Iron, Folic Acid and Zinc

In HPMC
Vegetable
Capsule Shell

A complete care for mother

Folic Acid
- Ensures maturation of RBCs
- Prevents megaloblastic anemia in pregnancy

Zinc
- Strengthens internal immune system
- Vital for fetal growth

Carbonyl Iron
- Safe, non-toxic form of elemental iron
- Boosts up the immune system

*To be dispensed only by or on the prescription of a registered physician

Labaid Pharma Quality First...

Scan here to find our page instantly :
"Like" us on facebook
fb.com/labaidpharmaceuticals

LABAID
PHARMACEUTICALS LIMITED
Bay Tower (Level-2), House 23, Gulshan-1, Dhaka-1212
Phone : 88 02 222299910, Fax : 88 02 9615497
info@labaidpharma.com, www.labaidpharma.com

ওভারিয়ান সিস্ট : লক্ষণ, ধরন ও চিকিৎসা

ডা. সেরাজুম মুনিরা
এমবিবিএস, বিসিএস, এফসিপিএস (গাইনি এন্ড অবস),
এমসিপিএস (গাইনি এন্ড অবস),
এফসিপিএস (রিপ্রোডাক্টিভ এন্ডোক্রাইনোলজি ও ইনফার্টিলিটি)
অবস্, গাইনি, ইনফার্টিলিটি বিশেষজ্ঞ ও ল্যাপারোস্কোপিক সার্জন
প্রাক্তন কনসালট্যান্ট, রিপ্রোডাক্টিভ এন্ডোক্রাইনোলজি
ও ইনফার্টিলিটি বিভাগ,
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়
চেম্বার : ল্যাবএইড স্পেশালাইজড হাসপাতাল

যেকোনো বয়সী নারীদের মধ্যেই ওভারিয়ান সিস্ট দেখা দিতে পারে। তবে যাঁদের ওজন বেশি, অনিয়মিত ঋতুস্রাব ও ওভারিয়ান সিস্টের পারিবারিক রোগ ইতিহাস আছে, তাঁরা কিছুটা বেশি ঝুঁকিতে থাকেন। কোনো কোনো সিস্টের ক্ষেত্রে ব্যথা বা উপসর্গ কিছুই দেখা যায় না। আবার কিছু সিস্টের ক্ষেত্রে পেটে তীব্র ব্যথাসহ নানা রকম লক্ষণও দেখা দিতে পারে।

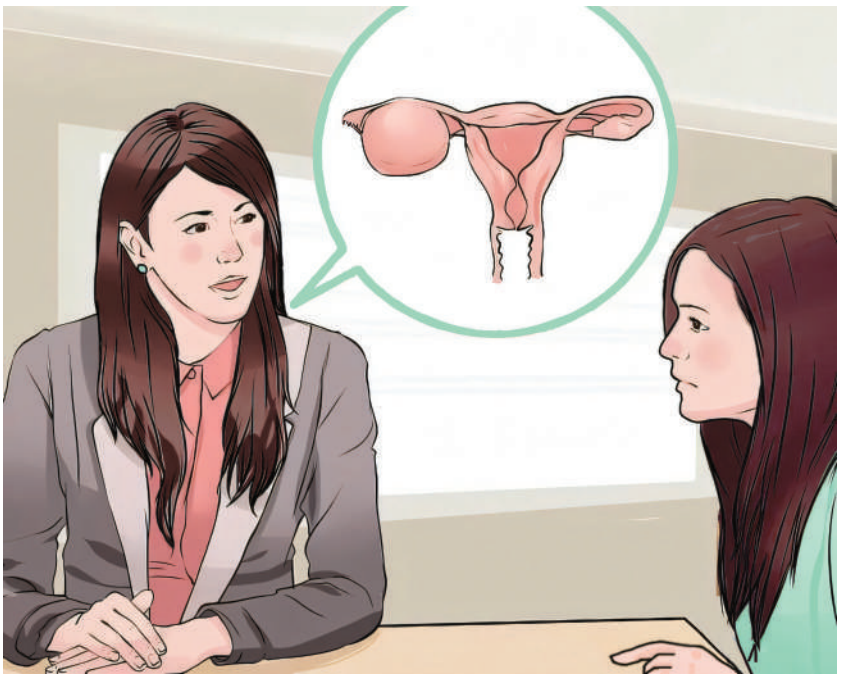

ওভারিয়ান সিস্ট কী

ডিম্বাশয়ে তরলযুক্ত থলির নাম জরায়ু সিস্ট। এসব থলির সংখ্যা হতে পারে এক বা একাধিক। ওভারি থেকে কোনো কারণে ডিম্ব স্ফুটন না হলে অথবা ডিম্ব স্ফুটন হওয়ার পরও ফলিকলগুলো চুপসে বা মিলিয়ে না গেলে সিস্ট তৈরি হতে পারে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সিস্টের কোনো লক্ষণ বা উপসর্গ দেখা যায় না এবং শরীরেও খুব একটা ক্ষতিকর প্রভাব দেখা দেয় না। এগুলো দুই-তিন মাসের মধ্যে এমনিতেই সেরে যায়। কিন্তু এমন কিছু সিস্ট আছে, যা থেকে বন্ধ্যাত্ব সমস্যার মতো শারীরিক জটিলতা দেখা দিতে পারে।

লক্ষণ ও উপসর্গ

সাধারণত প্রাথমিক পর্যায়ে ওভারিয়ান সিস্টের কোনো লক্ষণ বা উপসর্গ দেখা যায় না। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কতগুলো লক্ষণ বা উপসর্গ দেখা দিতে পারে। যেমন—

- অনিয়মিত ঋতুস্রাব ও ঋতুস্রাবের সময় মারাত্মক ব্যথা।

এশিয়ান রিসার্চ জার্নাল অব গাইনিকোলজি অ্যান্ড অবস্টেট্রিকসের তথ্যমতে, বাংলাদেশে শতকরা প্রায় ১৮ জন নারী ওভারিয়ান সিস্টে আক্রান্ত।

- তলপেট ফুলে যাওয়া।
- প্রস্রাবে সমস্যা।
- বমি বমি ভাব।
- ডায়রিয়া অথবা কোষ্ঠকাঠিন্য।
- পেট ফাঁপা ও বুকে জ্বালাপোড়া।
- কখনো সিস্টের কারণে ওজন বেড়ে যেতে পারে। কিন্তু যদি সিস্টে ক্যানসার দেখা দেয়, তাহলে ওজন কমে যায়।

ওভারিয়ান সিস্টের ধরন

ফাংশনাল সিস্ট

শরীরে হরমোনের ভারসাম্যহীনতা তৈরি হলে ডিম্ব স্ফুটন ব্যাহত হয়। ডিম্ব স্ফুটন না হলে ডিম্বাণুর মধ্যে তরল জমে সিস্টের সৃষ্টি হয়। আবার কখনো ডিম্বাণু নিঃসরণের পর ফলিকলগুলো মিলিয়ে না গিয়ে তরলযুক্ত থলির সৃষ্টি করে। এ দুটিকে যথাক্রমে ফলিকুলার ও কর্পাস লুটিয়াম সিস্ট বলা হয়।

পলিসিস্টিক (পিসিওএস) সিস্ট

দীর্ঘদিন ক্রমাগত ডিম্ব স্ফুটন না হলে ফলিকলগুলো ওভারিতে জমতে থাকে এবং তা তরলযুক্ত থলিতে পরিণত হয়। এর সংখ্যা ১০ বা এর বেশি হলে তাকে পলিসিস্টিক ওভারি বলা হয়। এ ক্ষেত্রে অনিয়মিত মাসিক বা মাসিক বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো লক্ষণ দেখা দেয়।

চকলেট সিস্ট

সাধারণত ওভারিতে মাসিকের রক্ত জমাট বেঁধে যে সিস্ট হয় তাকে চকলেট সিস্ট বলা হয়। এতে প্রচণ্ড ব্যথা হয়। এই সিস্ট খুব দ্রুত অপারেশন না করালে পরবর্তী সময়ে বন্ধ্যাত্ব থেকে শুরু করে আরো অনেক রকম সমস্যা করতে পারে।

ডারময়েড সিস্ট

ডারময়েড সিস্ট মূলত একধরনের ওভারিয়ান টিউমার। জরায়ুর কোষ থেকে ডারময়েড সিস্ট তৈরি হয়।

রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা

বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অন্য কোনো জটিলতা নির্ণয়ে আলট্রাসনোগ্রাফি করার সময় চিকিৎসকেরা সিস্ট খুঁজে পেতে পারেন। সিস্টের ধরন যদি ফাংশনাল হয় এবং সিস্টের আকার ৫ সেন্টিমিটারের নিচে থাকলে চিকিৎসক দুই-তিন মাস রোগীকে অবজারভেশনে রাখেন। সাধারণত এ সময়ের মধ্যে ফাংশনাল সিস্ট এমনিতেই ঠিক হয়ে যায়। কিন্তু বিভিন্ন লক্ষণ ও উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে এলে চিকিৎসক বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে রোগ ও রোগের ধরন সম্পর্কে নিশ্চিত হন। যেমন ট্রান্স-ভেজাইনাল আলট্রাসাউন্ড, ল্যাপারোস্কপি, সিটি স্ক্যান, এমআরআই স্ক্যান, ম্যামোগ্রাম ও ব্লাড টেস্ট। সিস্টের আকার খুব বড় হলে প্রস্রাব-পায়খানা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। খুব তাড়াতাড়ি যদি একটা সিস্ট বড় হয়ে যায়, তাহলে ম্যালিগনেন্সির আশঙ্কা থাকে। সে ক্ষেত্রে কালার ডপলার, আলট্রাসনোগ্রাফি ও এমআরআই করে নিশ্চিত হতে হবে। এ ছাড়া কিছু টিউমার মার্কার যেমন— CA-125, CA 19-9 ও আলফা-ফেটোপ্রোটিন টেস্ট করেও সিস্টে ক্যানসার শনাক্ত করা যায়।

ল্যাপারোস্কোপিক সার্জারি

সিস্টের ধরন জটিল হলে সে ক্ষেত্রে সার্জারির প্রয়োজন হয়। বর্তমানে ল্যাপারোস্কোপি সার্জারি অত্যন্ত আধুনিক ও কার্যকর একটি পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে নাভির পাশে ছোট ছোট ছিদ্র করা হয়। তারপর ছিদ্রের ফাঁকা অংশ দিয়ে প্রযুক্তির সাহায্যে সিস্ট বের করে আনা হয়। এতে অতিরিক্ত কাটাছেঁড়ার প্রয়োজন হয় না। ওপেন সার্জারির তুলনায় এ পদ্ধতি খুবই সহজ ও নিরাপদ।

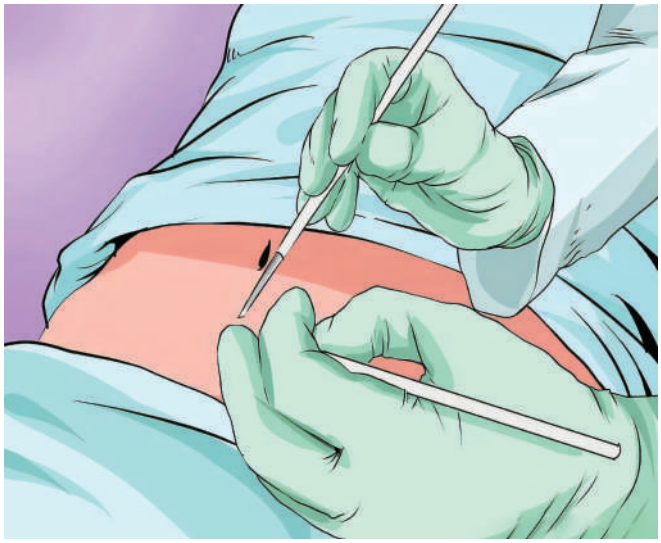

প্রতিরোধে করণীয়

- পরিবারে কারো ওভারিয়ান সিস্ট থাকলে আগে থেকে সচেতন থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রে বিয়ে করা এবং সন্তান নেওয়ার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
- শরীরে ইস্ট্রোজেন হরমোনের ভারসাম্য যেন বজায় থাকে, সেদিকে লক্ষ রাখুন।
- বডি মাস ইনডেক্স অনুযায়ী শরীরের ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখুন।
- অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস ও অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন পরিহার করুন।
- প্রাত্যহিক খাদ্যতালিকায় ফলমূল, সবুজ শাকসবজি ও গোটা শস্য রাখুন।
- নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনের পাশাপাশি সুচিকিৎসা গ্রহণ করুন।
- সিস্টের লক্ষণ দেখা দিলে অবহেলা না করে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

গবেষণায় দেখা গেছে, ৩৫-৪৫ বছর বয়সী নারীদের ওভারিয়ান সিস্ট হওয়ার ঝুঁকি বেশি।

হাড়ের রোগ অস্টিওপোরোসিস : প্রতিরোধে করণীয়

ডা. মো. জিয়া উদ্দিন
এমবিবিএস, ডি-অর্থো,
এমএস (অর্থো সার্জারি) অর্থোপেডিক ও ট্রমা
হাড় ও জয়েন্ট বিশেষজ্ঞ এবং স্পাইন সার্জন
প্রাক্তন কনসালট্যান্ট, শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ
সিনিয়র কনসালট্যান্ট,
ল্যাবএইড স্পেশালাইজড হাসপাতাল

হাড়ের ক্ষয়রোগ অস্টিওপোরোসিস। এ রোগে আক্রান্ত হলে হাড়ের ঘনত্ব কমে যায়। ফলে হাড়ের স্বাভাবিক গঠন নষ্ট হয়। এতে হাড় ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা কয়েক গুণ বেড়ে যায়। অস্টিওপোরোসিসে কোমরের হাড়, মেরুদণ্ড, হাঁটু ও হাতের কবজির হাড় ভাঙার ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি থাকে। পুরুষদের তুলনায় নারীরা এ রোগে বেশি আক্রান্ত হন। নারীদের মেনোপজের পর অস্টিওপোরোসিসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়। অন্যান্য রোগের মতো শুরুতেই এ রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় না। ধীরে ধীরে হাড় ক্ষয় হয়, কিন্তু বোঝা যায় অনেক পরে। এ জন্য এ রোগকে বলা হয় নীরব ঘাতক। সঠিক চিকিৎসা ও নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনের মাধ্যমে অস্টিওপোরোসিস প্রতিরোধ করা সম্ভব।

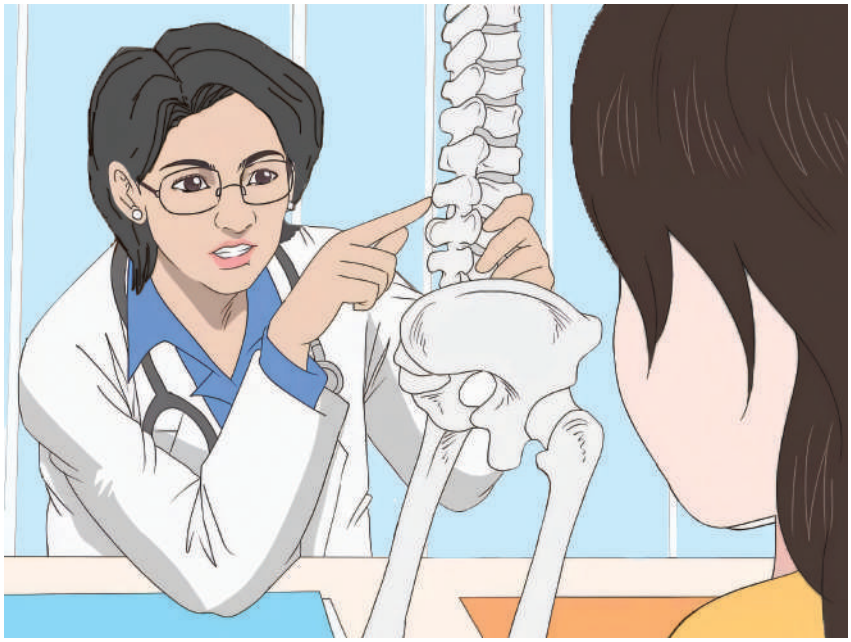

অস্টিওপোরোসিস কী

মানুষের শরীরে হাড়ের কাঠামো দুর্বল হয়ে যাওয়াই হলো অস্টিওপোরোসিস। আমাদের শরীরে যে হাড় থাকে, তা ওপর থেকে দেখে মসৃণ মনে হয়। কিন্তু মাইক্রোস্কোপের নিচে আনলে দেখা যাবে, আমাদের হাড়ের দেয়ালে অসংখ্য ছিদ্র আছে। যাদের হাড়ের ঘনত্ব ভালো তাদের হাড়ের ছিদ্রগুলো অনেক ছোট হয়। কিন্তু বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্যালসিয়াম, ভিটামিন-ডি ও হরমোনের ঘাটতিজনিত নানা সমস্যায় হাড়ের ঘনত্ব কমে হাড় পাতলা হয়ে যায় ও হাড়ের ছিদ্রগুলো বড় হতে শুরু করে। সেই সঙ্গে হাড়ে থাকা খনিজ উপাদানগুলো দ্রুত কমতে থাকে। ফলে শরীরের হাড় দুর্বল হয়ে যায় এবং ক্ষয় হতে থাকে। একসময় অল্প আঘাতেই ভেঙে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়, যাকে অস্টিওপোরোসিস বলে।

অস্টিওপোরোসিস কেন হয়

প্রধানত, ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন-ডির অভাবে অস্টিওপোরোসিস হয়। এ ছাড়া আরও যেসব কারণে এ রোগ হতে পারে—

- হরমোন কমে যাওয়া।

বাংলাদেশ অর্থোপেডিক সোসাইটির তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার ৩ শতাংশই অস্টিওপোরোসিস বা হাড় ক্ষয় রোগে আক্রান্ত।

- ভিটামিন-ডি ও ক্যালসিয়ামসমৃদ্ধ খাবার না খাওয়া।
- প্রোটিনযুক্ত খাবার কম খাওয়া।
- স্টেরয়েডজাতীয় ওষুধ সেবন।
- দীর্ঘ সময় বসে কাজ করা।
- ধূমপান, মদ্যপান ও অতিরিক্ত চা-কফি পান করা।
- শারীরিক পরিশ্রম কম করা।
- পরিবারের কোনো সদস্যের হাড়ক্ষয় রোগ থাকা।

এ ছাড়া যাদের ক্যানসার, থাইরয়েড, অপুষ্টিজনিত রোগ, কিডনি রোগ ও বাতজনিত রোগ আছে তাদের অস্টিওপোরোসিসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি অনেক বেশি।

লক্ষণ ও উপসর্গ

হাড়ের ব্যথা বা অল্প আঘাতে হাড় ভেঙে যাওয়া অস্টিওপোরোসিসের প্রধান লক্ষণ। এ ছাড়া—

- শরীরের উচ্চতা কমে যাওয়া।
- কোমর বা শরীরের কোনো অংশে সব সময় ব্যথা অনুভব করা।
- মেরুদণ্ডের হাড় ভাঙার ফলে কোমরের হাড়ের গঠন পরিবর্তন হয়ে যাওয়া।
- পেশিশক্তি কমে যাওয়া।
- পিঠের পেছনে ব্যথা অনুভব করা।

বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নারীদের অস্টিওপোরোসিসের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়

চল্লিশোর্ধ্ব নারীরা অস্টিওপোরোসিসে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হন। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নারীদের দেহে ইস্ট্রোজেন হরমোনের অভাব দেখা দেয়। বিশেষ করে, মাসিক বন্ধ হয়ে গেলে অর্থাৎ মেনোপজের পর এটি বেশি হয়। ইস্ট্রোজেন হরমোন হাড়ের ঘনত্ব বজায় রাখে। মেনোপজের পর এই হরমোনের পরিমাণ কমতে থাকে। আর হরমোন কমে গেলে রক্তে ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন-ডির অভাব দেখা দেয়। এ অভাব পূরণ করতে ভিটামিন ও ক্যালসিয়াম হাড় থেকে রক্তে চলে আসে। ফলে শরীরে এ দুটি উপাদানের ভারসাম্য নষ্ট হয়। ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন-ডির অভাবে হাড় ভঙ্গুর হয়ে যায়; শুরু হয় হাড়ক্ষয়। ফলে মেনোপজের পর হাড়ে সামান্য আঘাত লাগলে তা সহজেই ভেঙে যায়।

অস্টিওপোরোসিস শনাক্তকরণ

বিভিন্ন বয়সে হাড়ের ঘনত্বের একটি নির্দিষ্ট মাত্রা থাকে। অস্টিওপোরোসিসে আক্রান্ত হলে এই ঘনত্বের মাত্রার পার্থক্য ঘটে। সাধারণত কোমর ও মেরুদণ্ডের হাড়ের ঘনত্ব ডিস্ক স্ক্যানের মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয় এবং তা থেকে হাড় ভাঙার ঝুঁকি নির্ণয় ও সঠিক চিকিৎসাব্যবস্থা নির্ধারণ করা হয়। এ ছাড়া হাড় ভাঙার আগেই সঠিক সময়ে অস্টিওপোরোসিস শনাক্ত করার জন্য বোন মিনারেল ডেনসিটি পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। অস্টিওপোরোসিসে হাড়ের সাদাভাব কমে যায়, হাড়ের টিউবের দেয়াল পাতলা হয়ে যায় যা এক্স-রের মাধ্যমে শনাক্ত করা হয়।

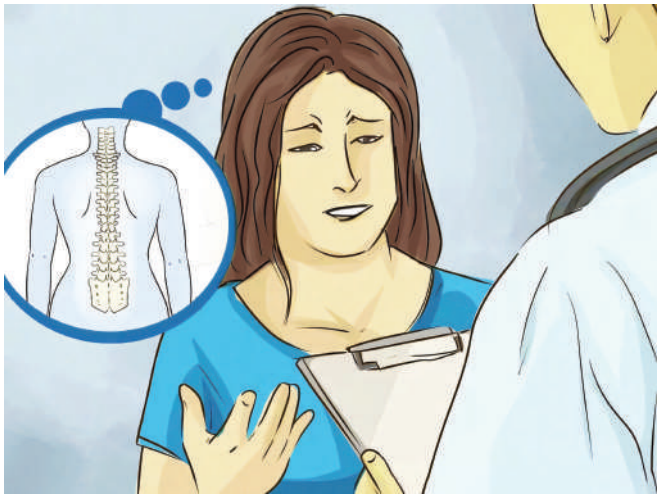

অস্টিওপোরোসিসের চিকিৎসা

অস্টিওপোরোসিসের চিকিৎসার প্রধান উদ্দেশ্য হলো হাড় ভাঙার ঝুঁকি কমানো। এ ক্ষেত্রে ডিস্ক স্ক্যানে অস্টিওপোরোসিস শনাক্ত হলে অস্টিওপোরোটিক ড্রাগ দেওয়া হয় রোগীকে। মেনোপজ, হিস্টেরেকটমির পর নারীদের এই রোগ হলে চিকিৎসার জন্য হরমোন প্রতিস্থাপন থেরাপি দেওয়া যেতে পারে। ইস্ট্রোজেন হরমোনের কাজ করে এমন ড্রাগও দেওয়া হয়। এ ছাড়া এ রোগের চিকিৎসায় সঠিক মাত্রায় ক্যালসিয়ামজাতীয় ট্যাবলেট, বিসফসফোনেট ইবানড্রোনিক এসিড, জোলেনড্রোনিক অ্যাসিডজাতীয় ওষুধ ব্যবহৃত হয়, যা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী গ্রহণ করতে হবে।

প্রতিরোধে করণীয়

অন্য অনেক রোগের মতোই অস্টিওপোরোসিস প্রতিরোধযোগ্য। এ জন্য—

- প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় ক্যালসিয়ামসমৃদ্ধ খাবার যেমন— দুধ, দই, পনির, মাখন, সয়াবিন, ছোলা, বাদাম, ইত্যাদি রাখুন।
- পর্যাপ্ত প্রোটিনজাতীয় ও আঁশযুক্ত খাবার খান।
- সবুজ শাকসবজি ও ফলমূল খান।
- পর্যাপ্ত পানি পান করুন।
- অতিরিক্ত তেল-চর্বি ও চিনিযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলুন।
- ভিটামিন-ডির অভাব পূরণে প্রতিদিন কিছু সময় সূর্যের আলোতে থাকুন, নির্দিষ্ট পরিমাণে সামুদ্রিক মাছ, মাশরুম ও ডিমের কুসুম খান।
- ধূমপান ও মদ্যপান ত্যাগ করুন।
- প্রতিদিন কমপক্ষে ৩০ মিনিট ব্যায়াম বা যে কোনো শারীরিক পরিশ্রম করুন।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সাম্প্রতিক এক জরিপে দেখা গেছে, শতকরা ৪৫ জন নারী অস্টিওপোরোসিসের তীব্র ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও কোনো চিকিৎসা গ্রহণ করেন না।

Bonaid 150

Ibandronic Acid 150 mg Tablet

Recovers BMD with Quality API

Polpharma
European API
Poland

- Restores Bone Mineral Density (BMD)
- Two times more potent than Risedronate
- Once monthly dose
- Ensures early recovery from Osteoporosis

labaid pharma Quality First...

Scan here to find our page instantly :
"Like" us on facebook
fb.com/labaidpharmaceuticals

LABAID
PHARMACEUTICALS LIMITED
Bay Tower (Level 2), House 23, Gulshan 1, Dhaka-1212
Phone : 88 02 222299910, Fax : 88 02 9615497
info@labaidpharma.com, www.labaidpharma.com

নারীর মেনোপজ : কী ধরনের প্রভাব ফেলে মন ও শরীরে

ডা. নায়ার ইসলাম (বিন্দু)
এমবিবিএস, এমসিপিএস (গাইনি),
এফসিপিএস (গাইনি)
কনসালট্যান্ট,
খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
স্ত্রী ও প্রসূতিরোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন,
ল্যাবএইড ডায়াগনস্টিকস, খুলনা

যখন প্রথমবার পিরিয়ড শুরু হয়, তাকে বলা হয় মেনার্কি। আর যখন পিরিয়ড স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যায়, তার নাম মেনোপজ। সাধারণত ৪৬ থেকে ৫২ বছরের মধ্যে নারীদের মেনোপজ হয়। আবার কারো কারো ৪০ বছরের আগেই মেনোপজ হতে পারে। এই অবস্থাকে বলা হয় প্রিম্যাচিউর ওভারিয়ান ফেইলিওর। মেনোপজ একজন নারীর জীবনে খুবই সাধারণ ঘটনা। কিন্তু মন ও শরীরে রয়েছে এর ব্যাপক প্রভাব। খিটখিটে মেজাজ, ঘুমের স্বল্পতা, হাড়ক্ষয় রোগসহ শরীরে নানা প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এ সময়।

মেনোপজের ধরন

স্বাভাবিক মেনোপজ

সাধারণত ৮ থেকে ১৩ বছর বয়সের মধ্যে একটি মেয়ে বয়ঃসন্ধিতে প্রবেশ করে। এ সময় তার মাসিক শুরু হয়। আর ৪৫ থেকে ৫৫ বছর বয়সে তা পুরোপুরি শেষ হয়ে যায়। বাংলাদেশে নারীদের মধ্যে গড়ে ৫১ বছর বয়সে স্থায়ীভাবে মাসিক বন্ধ হয়ে যায়। একটি কন্যাশিশু যখন মায়ের গর্ভে থাকে তখনই তার ডিম্বাশয়ে প্রায় ৭০ লাখ ডিম্বাণু থাকে। জন্মের সময় তা কমে গিয়ে ১০-১২ লাখে পৌঁছায়। আর কিশোরী বয়সে তা নেমে আসে ৩-৫ লাখে। এভাবে ক্রমশ ডিম্বাশয়ে ডিম্বাণুর সংখ্যা কমতে থাকে। পূর্ণ বয়স হলে যখন মাসিক শুরু হয়, তখন প্রত্যেক মাসে তা নিষিক্ত হতে থাকে। আবার অনেক ডিম্বাণু না ফুটেই নষ্ট হয়ে যায়। নিষিক্ত হওয়া ডিম্বাণু থেকেই মেয়েদের হরমোন তৈরি হয়। বয়স যত বাড়তে থাকে, ডিম্বাণুর সংখ্যা ততটাই কমতে থাকে। তাছাড়া বয়সের একটা পর্যায়ে এসে অবশিষ্ট ডিম্বাণু আর নিষিক্ত হতে পারে না। নারীদেহের এমন শারীরিক পরিবর্তন ও অবস্থাকে স্বাভাবিক মেনোপজ বলা হয়।

বাংলাদেশ মেনোপজ সোসাইটির তথ্যমতে, এ দেশে নারীদের মেনোপজের গড় বয়স ৫১ বছর।

কৃত্রিম মেনোপজ

কোনো কারণে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে নারীর ২টি ওভারি অথবা জরায়ু ফেলে দেওয়া হলে, পিরিয়ড স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যায়। এ ছাড়া তেজস্ক্রিয় রশ্মি বা কেমোথেরাপির কারণে যদি ডিম্বাশয়ের রক্তসঞ্চালন কমে যায়, তাহলেও মেনোপজ হতে পারে।

মন ও শরীরে মেনোপজের প্রভাব

হাড়ক্ষয় রোগ

মেনোপজের কারণে নারীর হাড়ে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। এ সময় হাড়ের ক্যালসিয়াম কমতে শুরু করে। এতে হাড় দুর্বল হয়ে যায়। বিশেষ করে কোমর ও কোমরের নিচের দিকের হাড় খুবই দুর্বল হয়ে যায়। বেশির ভাগ নারীই মেনোপজের পর কোমরের ব্যথায় ভুগে থাকেন। কারো মেরুদণ্ড বাঁকা হয়ে যায়, সামনের দিকে শরীর ঝুঁকে পড়ে। এ কারণে বাঁকা হয়ে হাঁটতে দেখা যায় অনেক নারীকে। এ ছাড়া হাঁটু ও অস্থিসন্ধিতে ব্যথাসহ বিভিন্ন জায়গায় হাড়ের ব্যথা হয়। এ অবস্থাকে বলা হয় অস্টিওপরোসিস।

ব্যথাযুক্ত সহবাস

মেনোপজের কারণে যোনিপথ শুষ্ক হয়ে যায়। তাই যৌনমিলনে নারী তীব্র ব্যথা অনুভব করেন। এ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট হরমোনের ওষুধ সেবন ও ক্রিম হিসেবে লুব্রিকেন্ট ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়।

হটফ্লাশ

মেনোপজের সময় আকস্মিকভাবে আগুনের হল্কার মতন শরীরে গরম অনুভূত হওয়া, রাতের বেলায় ঘাম হওয়া, ঘুম না হওয়া, দুশ্চিন্তা হওয়া, মনমরা ভাব এবং যৌনমিলনে আগ্রহ হারিয়ে ফেলার ঘটনা অতি সাধারণ।

দ্রুত প্রতিক্রিয়া

মেনোপজের পর নারীদের মধ্যে দ্রুত প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা নেতিবাচক হতে পারে। যেমন হুটহাট রেগে যাওয়া, অল্পতে কেঁদে ফেলা ইত্যাদি।

যৌনাঙ্গ ও প্রস্রাবে জ্বালাপোড়া

প্রজননতন্ত্রে ইস্ট্রোজেনের অভাবে যোনিপথ শুকিয়ে যায়। এ ছাড়া এ সময় হরমোনের অভাবে জরায়ু নিচে নেমে আসে। মেনোপজের সময় শরীরের রোগ প্রতিরোধব্যবস্থাও কমে যায়। যার ফলে ঘন ঘন যৌনাঙ্গে নানা সংক্রমণ ও প্রস্রাবের প্রদাহ দেখা দেয়।

বিষণ্নতা ও মানসিক অবসাদ

ইস্ট্রোজেন হরমোনের অভাবে শরীরের ত্বক কুঁচকে যায়, দ্রুত চুল পড়ে ও চেহারার লাবণ্যতা কমে আসে। এ সময় নারীদের মধ্যে বিষণ্নতা জেঁকে বসে।

ভুলে যাওয়া বা মনোযোগ হারানো

এ সময় একজন নারীকে অসংখ্য শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। তা ছাড়া সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের কার্যকারিতাও কমতে থাকে। ফলে কোনো কিছু ভুলে যাওয়া বা মনোযোগ হারানোর মতো নানা পরিবর্তন দেখা দেয়।

কারো কারো দাড়ি-গোঁফ গজায়

মেনোপজের পর শরীরের বিভিন্ন হরমোনের ঘাটতি অথবা আধিক্য ঘটে। পুরুষ হরমোন (অ্যান্ড্রোজেন) প্রায় ৫০ শতাংশ কমে যায় কিন্তু ইস্ট্রোজেন বেশি কমাতে অ্যান্ড্রোজেনের কিছুটা আধিক্য হয়। তার ফলে মেনোপজের পরে অনেক নারীর মুখে অল্প কিছু দাড়ি ও গোঁফের রেখা দেখা দিতে পারে।

দ্রুত ওজন বৃদ্ধি ও হৃদ্‌রোগ

মেনোপজের পর শরীরে হরমোনের ভারসাম্যহীনতা তৈরি হয়। ফলে অনেক নারী দ্রুত মুটিয়ে যেতে থাকেন। এ সময় রক্তে চর্বি বাড়ে, বাড়ে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি। অনেকের বুক ধড়ফড় করে, রাতে পর্যাপ্ত ঘুমাতে পারেন না এবং ঘুমের মধ্যে প্রচণ্ড ঘাম দেখা দেয়।

> “ মেনোপজ একজন নারীর শরীর ও মনে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। তাই এ সময় জীবন যাপনে বিশেষ যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন। ”

মেনোপজে করণীয়

- মেনোপজ দীর্ঘ মেয়াদে হাড়ক্ষয় ও হৃৎপিণ্ডের ওপর প্রভাব ফেলে। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনে হরমোন প্রতিস্থাপন থেরাপি নিতে পারেন।
- তেল ও অধিক চর্বিযুক্ত খাবার পরিহার করে ভারসাম্যপূর্ণ ও সুষম খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুলুন।
- শরীরে পর্যাপ্ত ক্যালসিয়াম না থাকলে মেনোপজ-পরবর্তী সময়ে অস্টিওপোরোসিস জটিল আকার ধারণ করতে পারে। তাই খাদ্যতালিকায় রাখুন ক্যালসিয়ামসমৃদ্ধ খাবার।
- ফাইটোইস্ট্রোজেন-সমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে। যেমন—সয়া, তিল, বাদাম, মেথি, ফুলকপি, ব্রকলি, বাঁধাকপি। ড্রাই ফ্রুটস—যেমন খেজুর, অ্যাপ্রিকট ইত্যাদি।
- চুল পড়া ও ত্বকের লাবণ্যহীনতা কমাতে ভিটামিন ই-যুক্ত খাবার খেতে হবে। যেমন— সয়াবিন, বাদাম, অঙ্কুরিত সবজি, ডিম ইত্যাদি।
- সেলেনিয়াম হট ফ্লাশ কমায়। কলিজা, টুনা মাছ, টমেটো, পেঁয়াজ, ব্রকলি, রসুন ইত্যাদিতে সেলেনিয়াম আছে। এসব খাবার খেতে পারেন।
- দুশ্চিন্তা ও মানসিক চাপ কমাতে নিয়মিত শারীরিক ব্যায়াম করুন।

ব্রিটিশ হার্ট ফাউন্ডেশনের তথ্যমতে, মেনোপজের পর নারীদের হৃদ্‌রোগের ঝুঁকি কয়েক গুণ বেড়ে যায়।

Roxilab Plus

Cefuroxime 250 mg & Clavulanic Acid 62.5 mg **Tablet**
Cefuroxime 500 mg & Clavulanic Acid 125 mg **Tablet**
Cefuroxime 125 mg & Clavulanic Acid 31.25 mg/5ml **GFS**

Quality EUROPEAN API Product

Combination towards new hope

Direct Compressible Granules in tablet
Ensure rapid disintegration and increased stability

Taste Masked Granules in GFS
Offer greater palatability to the patients

USFDA pregnancy category B
Safe for pregnant women

Can be given from 3 months of age
Safe for pediatric patients

Labaid Pharma Quality First...

Scan here to find our page instantly :
"Like" us on facebook
fb.com/labaidpharmaceuticals

LABAID PHARMACEUTICALS LIMITED
Bay Tower (Level 2), House 23, Gulshan 1, Dhaka-1212
Phone : 88 02 222299910, Fax : 88 02 9615497
info@labaidpharma.com, www.labaidpharma.com

ডা. সাহানা পারভীন
অধ্যাপক, গাইনি অনকোলজি
জাতীয় ক্যানসার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, মহাখালী
সিনিয়র কনসালট্যান্ট, গাইনি অনকোলজি,
ল্যাবএইড ক্যানসার অ্যান্ড সুপার স্পেশালিটি সেন্টার

নীরব ঘাতক জরায়ুমুখের ক্যানসার

জরায়ুমুখের ক্যানসার হতে পারে যেকোনো বয়সেই। তবে সাধারণত ৩০ থেকে ৫৫ বছর বয়সী নারীদের মধ্যে এই ক্যানসারের হার বেশি। বাংলাদেশে নারীদের মধ্যে দ্বিতীয় প্রধান ক্যানসার—জরায়ুমুখের ক্যানসার। আক্রান্তের সংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশে নারীদের মধ্যে স্তন ক্যানসারের পরেই এর অবস্থান। অন্য ধরনের ক্যানসারের তুলনায় জরায়ুমুখের ক্যানসার খুব সহজে নির্ণয় করা যায়। তবে এই অসুখে আক্রান্ত নারীরা শুরুতে এর লক্ষণ বুঝতে পারেন না। সাধারণত জরায়ুমুখের ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার শেষ পর্যায়ে এসে ব্যথা দেখা দেয়। তাই একে বলা হয় নীরব ঘাতক। আবার লক্ষণ দেখা দিলেও অনেকেই এটাকে পিরিয়ডজনিত সমস্যা ভেবে ভুল করে থাকেন। এমন ভুল যেন না হয়, সে জন্য যেমন লক্ষণগুলো মনে রাখা জরুরি, পাশাপাশি জেনে নিতে হবে এর কারণ, ঝুঁকি ও প্রতিরোধে করণীয়।

জরায়ুমুখ ক্যানসার কী

সার্ভিক্যাল বা জরায়ুমুখের ক্যানসার হলো সার্ভিক্সে ভাইরাসের সংক্রমণ। যোনির সঙ্গে সংযুক্ত জরায়ুর নিচের অংশটিকে বলা হয় সার্ভিক্স। হিউম্যান প্যাপিলোমা নামক ভাইরাস দ্বারা সার্ভিক্স আক্রান্ত হলে এই অংশে অতিরিক্ত কোষের জন্ম হয়, যা পরবর্তীকালে ক্যানসারে পরিণত হতে পারে।

জরায়ুমুখ ক্যানসারের কারণ

হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাসকে জরায়ুমুখ ক্যানসারের প্রধান কারণ হিসেবে গণ্য করা হয়। প্রায় ১০০ প্রজাতির প্যাপিলোমা ভাইরাস রয়েছে, এর বেশির ভাগই জরায়ু ক্যানসারের জন্য তেমন ঝুঁকিপূর্ণ নয়। তবে জরায়ু ক্যানসারের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ এইচপিভি নম্বর ১৬, ১৮, ৩১, ৩৩, ৩৫। এ ধরনের অন্যান্য হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাসের কারণে ক্যানসারটি হয়ে থাকে। এ ছাড়াও জরায়ুমুখ ক্যানসারের অন্যান্য কারণগুলো হলো :

- ধূমপান।
- অল্প বয়সে বিয়ে বা যৌনমিলন।

বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ৮,২৬৮ জন নারী জরায়ুমুখ ক্যানসারে আক্রান্ত হন এবং ৪,৯৭১ জন নারী মারা যান।

- অপ্রাপ্ত বয়সে গর্ভধারণ ও অধিক সন্তান প্রসব করা।
- বহুগামিতা বা একাধিক যৌনসঙ্গী গ্রহণ করা।
- যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে অসচেতনতা।
- দীর্ঘদিন গর্ভনিরোধক ওষুধ সেবন করা।
- পিরিয়ডের সময় সচেতনতা ও পরিচ্ছন্নতার অভাব।

জরায়ুমুখ ক্যানসারের লক্ষণ ও উপসর্গ

- অনিয়মিত পিরিয়ড।
- তলপেটে তীব্র ব্যথা অনুভব করা।

- পিরিয়ড শেষ হওয়ার পরও রক্ত পড়া।
- মেনোপজের পরও মাঝেমধ্যে রক্ত পড়া।
- সাদা দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব হওয়া।
- যৌনমিলনের সময় অসহনীয় ব্যথা ও রক্তপাত হওয়া।
- ক্ষুধা কমে যাওয়া ও ক্লান্তি লাগা।

জরায়ুমুখ ক্যানসার নির্ণয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা

পেপ টেস্ট : এ পদ্ধতিতে জরায়ুমুখ তরল কোষ নিয়ে অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করা হয়। এ পরীক্ষার মাধ্যমে ক্যানসার, ক্যানসারের পূর্বাবস্থা ও জরায়ুমুখের অন্যান্য রোগ যেমন—ইনফ্লেমেশন বা প্রদাহ শনাক্ত করা যায়। এতে কোনো ব্যথা অনুভূত হয় না। এই টেস্টে খরচও কম।

ভায়া টেস্ট : অ্যাসিটিক অ্যাসিড (৩-৫ শতাংশ) তরল দিয়ে ভিজিয়ে জরায়ুমুখ সরাসরি দেখা হয় ভায়া টেস্টের মাধ্যমে। এতে জরায়ুমুখের রং পরিবর্তন না হলে ভায়া পজিটিভ হিসেবে চিহ্নিত হয়। পেপ টেস্টে অস্বাভাবিকতা কিংবা ভায়া পজিটিভ হলে, আরো কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা যেমন—কল্পোস্কোপি (জরায়ুমুখ ২ থেকে ২৫ গুণ বড় করে সরাসরি দেখার যন্ত্র) দিয়ে পরীক্ষা করে অথবা বায়োপসি করে ক্যানসার নির্ণয় করা হয়।

জরায়ুমুখ ক্যানসারের চিকিৎসা

জরায়ুমুখ ক্যানসারের চিকিৎসা শুরু করার আগে কয়েকটি বিষয় বিবেচনায় নিতে হয়। যেমন— ক্যানসারের স্টেজ, রোগীর বয়স ও স্বাস্থ্যের অবস্থা, ক্যানসারের বিস্তৃতি ইত্যাদি। এসব তথ্যের ওপর ভিত্তি করে চিকিৎসক সার্জারি বা থেরাপি দিয়ে থাকেন। জরায়ুমুখ ক্যানসারের কয়েকটি চিকিৎসাপদ্ধতি হলো—সার্জারি, কেমোথেরাপি ও রেডিওথেরাপি।

সার্জারি : ক্যানসারটি যদি প্রাথমিক অবস্থাতেই ধরা পড়ে বা বেশি ছড়িয়ে না পড়ে তাহলে সার্জারির মাধ্যমে চিকিৎসা করা হয়। সার্জারিতে সাধারণত আক্রান্ত স্থান ও এর আশপাশের স্থানের কোষ অপসারণ করা হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে জটিলতা বিবেচনায় সম্পূর্ণ জরায়ুমুখ অপসারণের প্রয়োজনও হতে পারে।

কেমোথেরাপি : রোগীকে সার্জারি করা সম্ভব না হলে কেমোথেরাপির মাধ্যমে চিকিৎসা দেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে ওষুধ ব্যবহার করে ক্যানসারের কোষগুলোকে ধ্বংস করা হয়। কেমোথেরাপি সার্জারির আগে বা পরে যেকোনো সময় দেওয়া যায়।

রেডিওথেরাপি : এ পদ্ধতিতে অতি শক্তিশালী এক্স-রে বা আলোকরশ্মির সাহায্যে ক্যানসারের কোষকে ধ্বংস করা হয়। কিছু ক্ষেত্রে সার্জারির আগে রেডিওথেরাপি দেওয়া হয়, যাতে আক্রান্ত স্থান খুব সহজে অপসারণ করা যায়। আবার, কখনো অবশিষ্ট ক্যানসার কোষকে ধ্বংস করার জন্য সার্জারির পরও রেডিওথেরাপি দেওয়া হয়ে থাকে।

জরায়ুমুখ ক্যানসার প্রতিরোধে করণীয়

- জরায়ুমুখ ক্যানসার প্রকাশ পেতে ১২ থেকে ১৫ বছরও সময় লেগে যেতে পারে। তাই বয়স ২১ বছর থেকে ৬৪ বছর পর্যন্ত বা বিয়ের পর প্রতি তিন বছর অন্তর পেপ টেস্ট বা ভায়া টেস্ট করুন।
- প্রতি পাঁচ বছর অন্তর এইচপিভি ডিএনএ টেস্ট করুন।
- একাধিক যৌনসঙ্গী জরায়ুমুখ ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে। তাই একজন সঙ্গী নির্বাচন করুন। এ ছাড়া অরক্ষিত যৌনমিলনে কনডম ব্যবহার করুন।
- অপ্রাপ্ত বয়সে বিয়ে বা গর্ভধারণ করা থেকে বিরত থাকুন।
- পিরিয়ডের সময় মানসম্মত স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহার করুন এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকুন।
- ক্যানসার শনাক্ত হলে আতঙ্কিত না হয়ে একজন ক্যানসার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। সাধারণত ক্যানসারের চিকিৎসাপদ্ধতি দীর্ঘমেয়াদি হয়ে থাকে। তাই মনোবল ধরে রাখুন এবং চিকিৎসা গ্রহণ অব্যাহত রাখুন।

জরায়ুমুখের ক্যানসারে আক্রান্তের দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে পঞ্চম।

বাড়ছে স্তন ক্যানসারের ঝুঁকি

ডা. পারভিন আখতার বানু
এমবিবিএস, বোর্ড সার্টিফাইড ইন রেডিয়েশন অনকোলজি (সিরাজ, ইরান)
প্রাক্তন সহকারী অধ্যাপক,
আহওয়াজ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, ইরান
প্রাক্তন প্রধান কনসালট্যান্ট, ক্যানসার বিশেষজ্ঞ,
ডেল্টা হাসপাতাল লি.
সিনিয়র কনসালট্যান্ট, ক্লিনিক্যাল অনকোলজি ও উপদেষ্টা,
ল্যাবএইড ক্যানসার হাসপাতাল

বিশ্বব্যাপী মানবমৃত্যুর দ্বিতীয় প্রধান কারণ ক্যানসার। নারী-পুরুষ উভয়ই যেকোনো কানসারে আক্রান্ত হতে পারেন। তবে পুরুষদের মধ্যে ফুসফুস, প্রোস্টেট ও কোলন ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার হার বেশি। অন্যদিকে, নারীরা বেশি আক্রান্ত হন স্তন, জরায়ু ও থাইরয়েড ক্যানসারে। বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে নারীরা সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হচ্ছেন স্তন ক্যানসারে। গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে প্রতিবছর ১৩ হাজারের বেশি নারী নতুন করে স্তন ক্যানসারে আক্রান্ত হন। সচেতনতা ও প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে স্তন ক্যানসারের ঝুঁকি দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে।

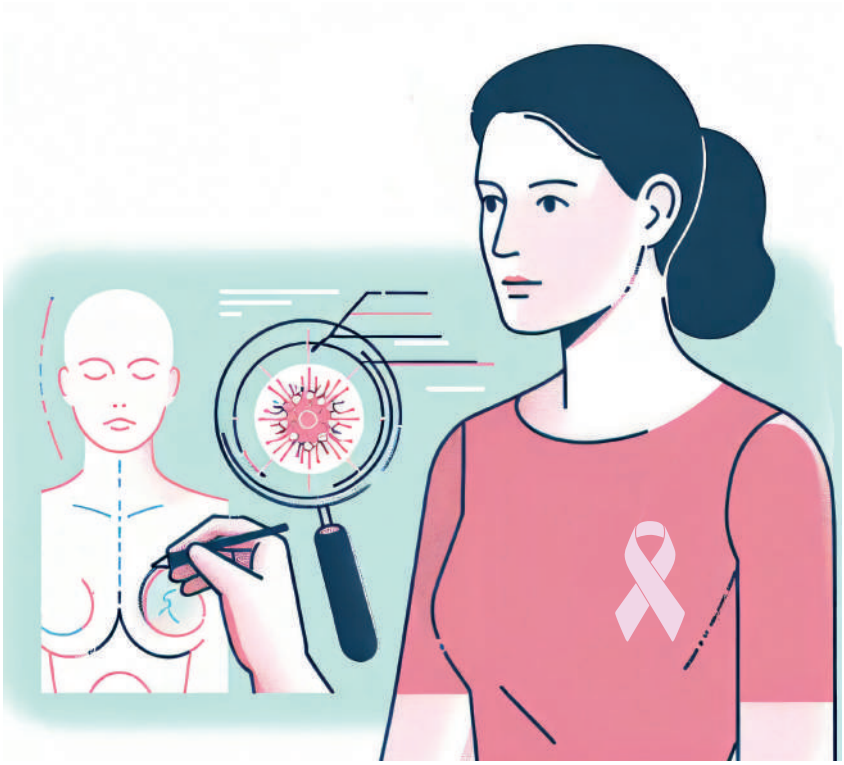

স্তন ক্যানসার কী

ক্যানসার মানেই কোষের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি। স্তন ক্যানসারও স্তনের কোনো অংশে কিছু কোষের অস্বাভাবিক বৃদ্ধির ফল। স্তনের যে অংশে কোষ বৃদ্ধি পায় স স্থানে কোষের অনিয়মিত ও অতিরিক্ত বিভাজনের ফলে টিউমার সৃষ্টি হয়। টিউমারটি রক্তনালি ও লসিকাগ্রন্থি হয়ে স্তনের বাইরে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে এবং ক্যানসারে পরিণত হয়।

লক্ষণ ও উপসর্গ

- স্তন স্পর্শ করলে ব্যথাহীন শক্ত কোনো চাকা বা দলার মতো অনুভূত হওয়া।
- স্তনের চারদিক, বগলের ভেতর বা আশপাশের কোনো স্থান ফুলে ওঠা।
- স্তন ব্যথা হওয়া।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যমতে, নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে স্তন ক্যানসারে মৃত্যুর হার শতকরা ৮০ ভাগ।

- স্তনের চামড়া কুঁচকে যাওয়া ও চামড়ার রং পরিবর্তন হয়ে যাওয়া।
- স্তনের আশপাশ লাল হয়ে যাওয়া।
- স্তনের আকার পরিবর্তন হয়ে যাওয়া।
- স্তনের বোঁটা বেঁকে যাওয়া বা ভেতরে ঢুকে যাওয়া।
- স্তনের বোঁটা দিয়ে রক্ত বা রক্তমিশ্রিত পদার্থ বের হওয়া।

যেসব নারীর স্তন ক্যানসারের ঝুঁকি বেশি

যেকোনো নারীই স্তন ক্যানসারে আক্রান্ত হতে পারেন। তবে ৪০ বছরের বেশি বয়সী নারীদের মধ্যে স্তন ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি। কোনো নারীর মা, খালা ও বোনের স্তন ক্যানসার থাকলে তাঁরও স্তন ক্যানসার হতে পারে। আরও কিছু কারণে স্তন ক্যানসারের ঝুঁকি বেড়ে যায়। যেমন—

- ১২ বছর বয়সের আগে পিরিয়ড শুরু হলে এবং ৫৫ বছর বয়সের পরেও মেনোপজ না হলে।
- ৩০ বছর বয়সের পরে সন্তান ধারণ করলে।
- শিশুকে বুকের দুধ না খাওয়ালে।
- ধূমপান ও মদ্যপান করলে।
- পর্যাপ্ত ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রম না করলে।
- অতিরিক্ত ওজন থাকলে।
- দীর্ঘদিন জন্মনিরোধক ওষুধ সেবন করলে।
- দীর্ঘমেয়াদি হরমোন প্রতিস্থাপন থেরাপি নিলে।

এ ছাড়া যাঁদের একবার একদিকের স্তনে ক্যানসার হয়েছে এবং যথাযথ চিকিৎসার পর ভালো আছেন, তাঁদের আবার অন্য স্তন ক্যানসার হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

> “ উপসর্গ দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে স্তন ক্যানসার পুরোপুরি ভালো হওয়া সম্ভব। ”

স্তন ক্যানসার নির্ণয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা

স্তনে চাকা বা ব্যথা হলে তা ক্যানসারের পর্যায়ে যাচ্ছে কি না এটা নির্ণয়ের জন্য রোগীর বয়স ও উপসর্গ অনুযায়ী কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়ে থাকে। সাধারণত, ৩৫ বছরের কম বয়সী নারীদের স্তনে চাকা থাকলে আলট্রাসনোগ্রাম করা হয়। ৩৫ বছরের বেশি বয়সী নারীদের করা হয় ম্যামোগ্রাম। কোনো রোগীর স্তনের বোঁটা দিয়ে যদি অস্বাভাবিক রস বের হয় তাহলে সাইটোলজি পরীক্ষা করা জরুরি। এ ছাড়া, স্তনের চাকা থেকে একটু কোষ নিয়ে এফএনএসি (ফাইন নিডল অ্যাসপিরেশন সাইটোলজি) পরীক্ষা করা যেতে পারে। স্তন টিউমার থেকে কোষ নিয়ে মাইক্রোস্কোপের নিচে কোর বায়োপসি পরীক্ষার মাধ্যমেও ক্যানসার শনাক্ত করা যায়। কোর বায়োপসি করলে টিউমারটির বৈশিষ্ট্য জানা যায় এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হয় যে আগে কেমোথেরাপি দিতে হবে নাকি আগে সার্জারি করতে হবে। কোর বায়োপসি করার পর ইমিউনোহিস্টোকেমিস্ট্রি করা অত্যন্ত জরুরি।

চিকিৎসাপদ্ধতি

স্তন ক্যানসারের চিকিৎসা রোগীর বয়স, ক্যানসারের আকার, আকৃতি, অবস্থান ও ক্যানসারের বিস্তৃতির ওপর নির্ভর করে। স্তন ক্যানসারের চিকিৎসাপদ্ধতিগুলোর মধ্যে রয়েছে—

অস্ত্রোপচার : প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থাৎ ক্যানসার শুধু স্তনে সীমাবদ্ধ থাকলে চিকিৎসার প্রথম ধাপ হিসেবে অস্ত্রোপচার করা হয়। অস্ত্রোপচারের পর কাটা টিউমারটি পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় রোগীর কেমোথেরাপি বা রেডিওথেরাপি লাগবে কি না।

কেমোথেরাপি : ক্যানসার যদি স্তনের আশপাশে ছড়িয়ে পড়ে তাহলে আগে কেমোথেরাপি দিয়ে টিউমারের আকৃতি ছোট করে নেওয়া হয়, তারপর অস্ত্রোপচার করা যেতে পারে।

রেডিওথেরাপি : ক্যানসার শরীরের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলে অস্ত্রোপচারের আগে রেডিওথেরাপি দেওয়া হয়। অস্ত্রোপচারের পরে প্রয়োজন অনুযায়ী হরমোন থেরাপি ও ইমিউনো থেরাপি দেওয়া প্রয়োজন। বর্তমানে ব্রেস্ট কনজারভিং সার্জারি পদ্ধতিতে স্তন না কেটেও স্তন ক্যানসারের চিকিৎসা করা যায়।

স্তন ক্যানসার কি পুরোপুরি নিরাময়যোগ্য

স্তন ক্যানসারের যেকোনো উপসর্গ দেখা দিলে যদি সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সঠিক চিকিৎসা নেওয়া হয়, তাহলে স্তন ক্যানসার থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়া সম্ভব। এ জন্য প্রতি মাসে পিরিয়ড শেষ হওয়ার ৩-৪ দিনের মধ্যে বা মাসের একটি নির্দিষ্ট সময়ে নিজে নিজে স্তন পরীক্ষা করতে হবে। যদি কোনো অস্বাভাবিকতা চোখে পড়ে তাহলে দেরি না করে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। তাছাড়া নিয়মিত ব্যায়াম, পুষ্টিকর খাবার, ওজন নিয়ন্ত্রণ, ধূমপান ও মদ্যপানের অভ্যাস ত্যাগ, সঠিক বয়সে সন্তান ধারণ, অতিরিক্ত জন্মনিরোধক ওষুধ সেবন না করার মাধ্যমে স্তন ক্যানসারের ঝুঁকি অনেকটাই এড়ানো সম্ভব।

স্তনে চাকা মানেই কি ক্যানসার

বেশির ভাগ নারী স্তনে চাকা হলেই ভয় পেয়ে যান এবং মনে করেন, তাঁর হয়তো স্তন ক্যানসার হয়েছে। কিন্তু এ ধারণা ভুল। অনেক সময় মাসিকের ১৫ দিন আগে স্তনে ব্যথা বা ছোট ছোট চাকা দেখা দিতে পারে, যা স্বাভাবিক। আবার প্রসূতি মায়েদের স্তনে দুধ জমে চাকার মতো হয়; ব্যথাও হতে পারে। এতে ভয় পাবেন না। স্তনে চাকা মানেই টিউমার বা ক্যানসার নয়। তবে যে কারণেই স্তনে চাকা হোক না কেন, এতে অবহেলা করা উচিত নয়। প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিশ্চিন্ত থাকা ভালো।

স্তন ক্যানসার ছোঁয়াচে কোনো রোগ নয়। কোনো মানুষের সংস্পর্শে বা যৌন সম্পর্কের মাধ্যমে এটি ছড়ায় না।

ডা. আলী নাফিসা
এমবিবিএস, এফসিপিএস (সার্জারি)
সহযোগী অধ্যাপক, সার্জারি বিভাগ
অনকোপ্লাস্টিক ব্রেস্ট সার্জন
ট্রেইন্ড অন অনকোপ্লাস্টিক ব্রেস্ট সার্জারি (ইউকে)
কনসালট্যান্ট, ল্যাবএইড ব্রেস্ট সেন্টার
ল্যাবএইড ক্যানসার হাসপাতাল

স্তন ক্যানসার শনাক্তে স্ক্রিনিংয়ের গুরুত্ব

বিশ্বব্যাপী নারীরা যে ধরনের ক্যানসারে আক্রান্ত হন, তার শতকরা ৩০ ভাগই স্তন ক্যানসার। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে প্রতি ৮ জন নারীর মধ্যে ১ জন নারী স্তন ক্যানসারে ভোগেন। বাংলাদেশে এ সংখ্যা কিছু কমবেশি হতে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে, ৩৫ বছর বয়সের পর নারীদের স্তন ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়। সঠিক সময়ে রোগ নির্ণয় করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসাব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে স্তন ক্যানসারে মৃত্যুর হার অনেকটাই কমানো সম্ভব।

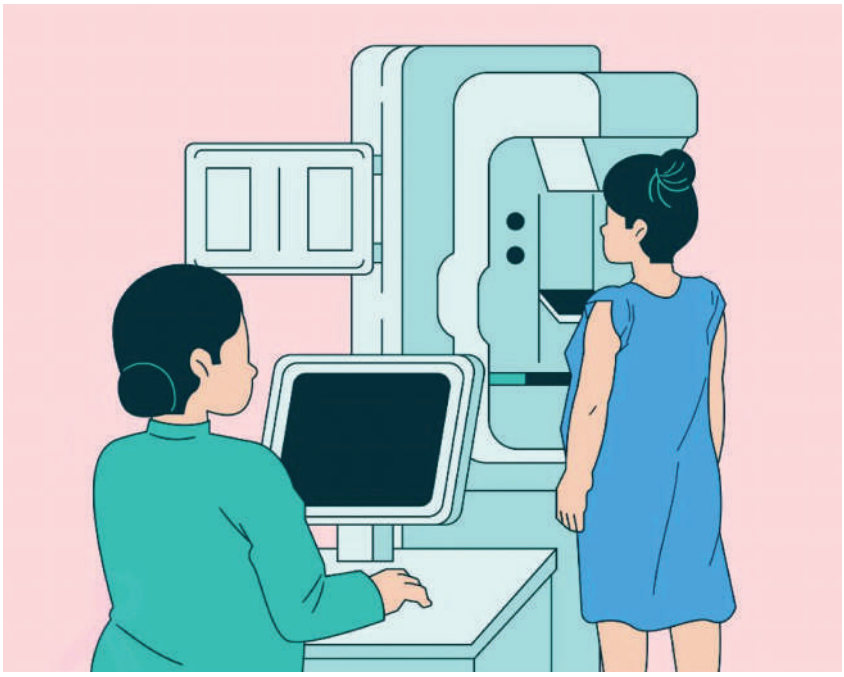

স্তন ক্যানসার কেন হয়

একজন নারীর বয়স যত বৃদ্ধি পায়, স্তন ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিও তত বেড়ে যায়। এ ছাড়া আরও কিছু কারণে স্তন ক্যানসার হতে পারে। যেমন—

- পরিবারে কারও স্তন ক্যানসার থাকা।
- শরীরে বিআরসিএ-১, বিআরসিএ-২ ও টিপি-৫৩ নামক স্তন ক্যানসার সৃষ্টিকারী জিনের অস্তিত্ব।
- স্তনের অস্বাভাবিক ঘনত্ব।
- অনিয়মিত পিরিয়ড।
- ৫ বছরের অধিক জন্মনিরোধক ওষুধ সেবন।
- ৩০ বছর বয়সের পর গর্ভধারণ।
- মেনোপজের পর দীর্ঘমেয়াদি হরমোন থেরাপি নেওয়া।
- ধূমপান ও মদ্যপান।
- নিয়মিত ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রম না করা।

জাতীয় জরায়ুমুখ ও স্তন ক্যানসার নির্ণয় ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী, ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের ৩ কোটি নারীকে স্ক্রিনিংয়ের আওতায় আনা হবে।

স্তন ক্যানসার স্ক্রিনিং কী

স্তন ক্যানসার স্ক্রিনিং হলো ক্যানসারের কোনো লক্ষণ প্রকাশ না পেলেও কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা। অনেক সময় স্ক্রিনিং পরীক্ষায় খুব ছোট আকৃতির টিউমার শনাক্ত হয়, যা হয়তো ক্যানসার হতে পারে। স্ক্রিনিংয়ের মাধ্যমে শুরুতেই এটি ধরা পড়লে যত দ্রুত সম্ভব প্রয়োজনীয় চিকিৎসাব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

কেন প্রয়োজন

স্ক্রিনিংয়ের মূল লক্ষ্য হলো- কোনো উপসর্গ প্রকাশ পাওয়ার আগেই পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া যে, রোগটি সুপ্ত অবস্থায় আছে কি না। এর মাধ্যমে ক্যানসার গুরুতর পর্যায়ে যাওয়ার আগেই প্রয়োজনীয় চিকিৎসাব্যবস্থা নেওয়া যায় এবং মৃত্যু ঝুঁকি কমানো যায়। ম্যামোগ্রামের মাধ্যমে স্ক্রিনিং পরীক্ষা করলে অনেক সময় স্তন ক্যানসার সৃষ্টি হওয়ার ১০ বছর পূর্বেই তা শনাক্ত করা যায়। প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থাৎ টিউমারের আকার ১ সেমি থাকা অবস্থায় এটি শনাক্ত করা হলে, অনেক সময় কেমোথেরাপি দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। কেমোথেরাপি দিলেও খরচ অনেক কম লাগে। আবার পুরো ব্রেস্ট ফেলতে হয় না। রোগীও পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠেন। তাই ৩৫ বছর বা এর বেশি বয়সী সব নারীর উচিত চিকিৎসকের পরামর্শে প্রতি ১ বা ২ বছর পরপর স্ক্রিনিং করানো।

যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে

সাধারণত, যাঁদের স্তন ক্যানসারের লক্ষণ নেই কিন্তু ঝুঁকি রয়েছে তাঁদের কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে স্ক্রিনিং করা হয়। যেসব নারীর স্তন ক্যানসারের উচ্চ ঝুঁকি রয়েছে তাঁদের ক্ষেত্রে এমআরআই (ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স ইমেজিং) করার প্রয়োজন হতে পারে। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে স্তন ক্যানসার নির্ণয়ে সবচেয়ে পরিচিত ও ব্যবহৃত স্ক্রিনিং পদ্ধতি হলো ম্যামোগ্রাফি। ম্যামোগ্রামের মাধ্যমে স্তন ক্যানসারের কোনো লক্ষণ আছে কি না, তা শনাক্ত করা হয়। কোনো অস্বাভাবিকতা দেখা গেলে সে অনুযায়ী পরবর্তী পরীক্ষা-নিরীক্ষা যেমন— আলট্রাসাউন্ড-গাইডেড কোর ব্রেস্ট বায়োপসি, এমআরআই গাইডেড কোর বায়োপসি এবং কিছু ক্ষেত্রে— স্টেরিওট্যাক্টিক বায়োপসি করা হয়।

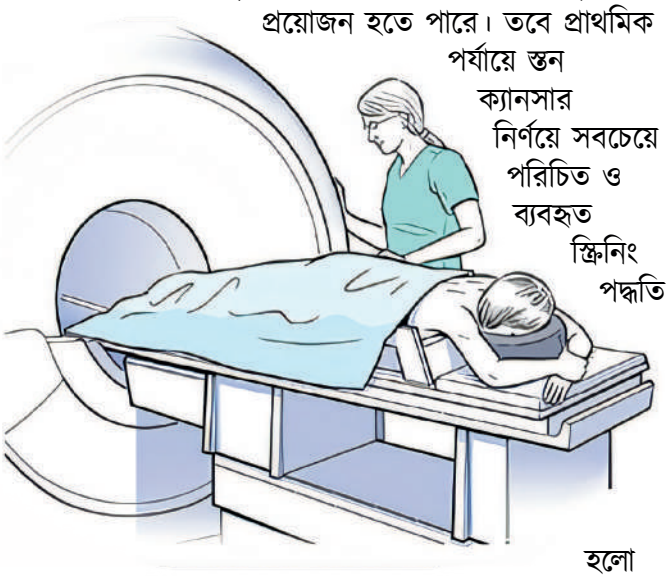

স্তন ক্যানসারে আক্রান্ত নারী গর্ভবতী হতে এবং বাচ্চাকে বুকের দুধ পান করাতে পারবেন কি না

কেমোথেরাপি দেওয়ার পর শতকরা ৬৫ জন নারী প্রজননক্ষমতা হারান। তাই কেমোথেরাপি দেওয়ার আগেই তাদের ডিম্বাণু বা প্রজনন টিস্যু সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা উচিত। এ ক্ষেত্রে অবিবাহিত মেয়েদের ডিম্বাশয় সংরক্ষণ করতে হবে। অন্যদিকে, বিবাহিত নারীদের সংরক্ষণ করতে হবে ডিম্বাণু কোষ ওসাইট ও নিষিক্ত ডিম্বাণু জাইগোট। চিকিৎসার ২ বছর পর পুনরায় গর্ভধারণের চেষ্টা করা যেতে পারে। আর, স্তন ক্যানসারে আক্রান্ত কোনো মা তাঁর সন্তানকে বুকের দুধ পান করাতে পারবেন না।

গর্ভাবস্থায় স্তন ক্যানসার শনাক্ত হলে কি গর্ভপাত জরুরি

যদি গর্ভাবস্থায় কোনো নারীর স্তন ক্যানসার শনাক্ত হয় তাহলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গর্ভপাত না করলেও সমস্যা হয় না। এ ক্ষেত্রে তাঁকে অবশ্যই নিয়মিত প্রয়োজনীয় চিকিৎসা নিতে হবে। ২য় ও ৩য় ত্রৈমাসিকের সময় কেমোথেরাপি দেওয়া যেতে পারে। তবে গর্ভাবস্থায় রেডিওথেরাপি দেওয়া যাবে না। সন্তান প্রসবের পর রেডিওথেরাপি দেওয়া যেতে পারে।

স্তন ক্যানসার হলে কি পুরো স্তনই ফেলে দিতে হবে

বর্তমানে স্তন ক্যানসারের চিকিৎসায় ব্রেস্ট কনজারভিং থেরাপি পদ্ধতি বেশি ব্যবহৃত হয়। এ পদ্ধতিতে অভিজ্ঞ ব্রেস্ট সার্জনের দ্বারা পুরো স্তন না ফেলে ক্যানসারের চিকিৎসা করা হয়। তবে টিউমারের ধরন ও ক্যানসারের বিস্তার অনুযায়ী কখনো কখনো পুরো স্তনই ফেলে দেওয়া লাগতে পারে। এ ক্ষেত্রে স্তনের স্বাভাবিক আকৃতি বজায় রাখতে সিলিকন ইমপ্লান্ট ব্যবহার করা হয়।

স্তন ক্যানসার প্রতিরোধের উপায়

স্তন ক্যানসার প্রতিরোধের সুনির্দিষ্ট কোনো উপায় না থাকলেও দৈনন্দিন জীবনে কিছু সচেতনতা অবলম্বন করলে এর ঝুঁকি অনেকটা কমানো সম্ভব। এ জন্য প্রত্যেক নারীর উচিত—

- স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন করা।
- ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা।
- প্রতিদিন অন্তত ১৫ মিনিট ব্যায়াম করা।
- ধূমপান ও মদ্যপান এড়িয়ে চলা।
- মেনোপজের পর দীর্ঘমেয়াদি কোনো হরমোন থেরাপি না নেওয়া।
- বাচ্চাকে বুকের দুধ পান করানো।
- দীর্ঘদিন জন্মনিরোধক ওষুধ সেবন না করা।

গবেষণায় দেখা গেছে, 3D বা ত্রিমাত্রিক ম্যামোগ্রাফি স্তন ক্যানসার শনাক্তকরণে সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি।

10606

LABAID

টেস্ট টিউব পদ্ধতিতে সাফল্যের হার
৪০%

নিঃসন্তান দম্পতির স্বপ্ন পূরণে

ল্যাবএইড ফার্টিলিটি সেন্টার

বন্ধ্যাত্বের
সর্বাধুনিক চিকিৎসা এখন ল্যাবএইড ফার্টিলিটি সেন্টারে

বন্ধ্যাত্ব থেকে সন্তান ধারণ পর্যন্ত সব পর্যায়ে পরিপূর্ণ সুচিকিৎসার জন্য ল্যাবএইড স্পেশালাইজড হাসপাতালে রয়েছে একদল সুদক্ষ চিকিৎসক ও অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরির সমন্বয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ **"ফার্টিলিটি সেন্টার"**। যেখানে সমন্বিত চিকিৎসার মাধ্যমে বন্ধ্যাত্ব রোগীদের চিকিৎসা প্রদান করা হয়।

পুরুষদেরও থাকতে পারে বন্ধ্যাত্ব। নারী বা পুরুষ যে কারও বন্ধ্যাত্বকে জয় করে সন্তান পাওয়ার আকাঙ্খা পূরণ করবে ল্যাবএইড।

ল্যাবএইড
ফার্টিলিটি সেন্টার
...where blossoms your dream baby

ল্যাবএইড ফার্টিলিটি সেন্টারের বৈশিষ্ট্য:

- ইউরোপিয়ান সোসাইটি অব হিউম্যান রিপ্রোডাকশন এন্ড এমব্রায়োলজির গাইডলাইন অনুসারে মান নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত।
- ল্যাবএইড ফার্টিলিটি সেন্টার সম্পূর্ণ হাই এফিসিয়েন্সি পার্টিকুলেট এয়ার ফিল্টার দ্বারা সুরক্ষিত।
- বিশ্বের খ্যাতিমান কোম্পানিসমূহ যেমন- অস্ট্রেলিয়ার কুক, ব্রিটেনের আরআই, যুক্তরাষ্ট্রের বিডি, ডেনমার্কের মেডিকাল্ট, জাপানের অলিম্পাস ইত্যাদি যন্ত্রপাতিসমৃদ্ধ ল্যাবরেটরি।
- এখানে রয়েছে দেশ-বিদেশের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বন্ধ্যাত্ব বিশেষজ্ঞ, এমব্রায়োলজিস্ট, এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট ও ইউরোলজিস্ট।

[বিস্তারিত জানার জন্য: 017 6666 0882]

ল্যাবএইড স্পেশালাইজড হাসপাতাল
বাড়ি ৬, রোড ৪, ধানমন্ডি, ঢাকা, ওয়েব : www.labaidgroup.com

LABAID
CANCER HOSPITAL
AND SUPER SPECIALITY CENTRE
Winning Cancer

ল্যাবএইড ক্যান্সার হাসপাতাল এন্ড সুপার স্পেশালিটি সেন্টারে সকল ধরনের চিকিৎসা সেবার সাথে আছে ক্যান্সার চিকিৎসায় বিশ্বমানের সেবা

২৪ ঘন্টা ইমার্জেন্সি

ভর্তি রোগীর সুব্যবস্থ (কেবিন, ডিলাক্স ও প্রাইভেট ডিলাক্স)

আইসিইউ /এইচডিইউ (প্রাইভেট আইসিইউর সুব্যবস্থা)

৬ টি মডিউলার অপারেশন থিয়েটার (যেখানে সকল ধরনের অপারেশন করা হয়)

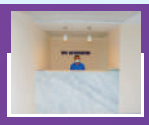
ওপিডি সেবা (যেকোনো ধরনের কনসালটেশন ও সকল ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা)

৩০ বেডের সুপ্রশস্ত কেমোথেরাপি ডে-কেয়ার

আন্তর্জাতিক মানের রেডিওথেরাপি সেবা (3D-CRT, VMAT, IMRT, SRS, SBRT, GRT)

ব্র্যাকিথেরাপি

আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষায়
LABAID My Health
হেলথ চেক-আপ প্যাকেজ

আমাদের রয়েছে -

- রেডিয়েশন অনকোলজি ইউনিট
  - এক্সটার্নাল বিম রেডিওথেরাপি
  - ব্র্যাকিথেরাপি
- মেডিকেল অনকোলজি ইউনিট
  - কেমোথেরাপি
  - টার্গেটেড থেরাপি
  - ইমিউনোথেরাপি
  - হরমোন থেরাপি
- সার্জিক্যাল অনকোলজি ইউনিট
  - গাইনী অনকোলজি ইউনিট
  - হেড-নেক অনকোলজি ইউনিট
  - অর্থো অনকোলজি ইউনিট
  - ইউরো-অনকোলজি ইউনিট
- মেডিসিন এন্ড এলাইড সার্ভিস
  - নিউরোলজি ইউনিট
  - পালমোনলজি/ রেস্পিরেটরি মেডিসিন ইউনিট
  - ইন্টারনাল মেডিসিন ইউনিট
  - এন্ডোক্রাইনোলজি ইউনিট
  - রিউমাটোলজি ইউনিট
  - ফিজিক্যাল মেডিসিন এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন ইউনিট
  - ডার্মাটোলজি ইউনিট
  - নেফ্রোলজি এন্ড ডায়ালাইসিস ইউনিট
- সার্জারি এন্ড এলাইড সার্ভিস
  - গাইনোকোলজি ইউনিট
  - জেনারেল এন্ড ল্যাপ্রোস্কপিক সার্জারি ইউনিট
  - ওরাল এন্ড ম্যাক্সিলোফেসিয়াল সার্জারি ইউনিট
  - ইএনটি সার্জারি ইউনিট
  - নিউরো সার্জারি ইউনিট
  - কলোরেক্টাল সার্জারি ইউনিট
  - থোরাসিক সার্জারি ইউনিট
  - অনকো প্লাস্টিক সার্জারি
- গ্যাস্ট্রোএন্টারলজি সেন্টার
- ব্রেস্ট সেন্টার
- হেপাটোবিলিয়ারি এন্ড প্যানক্রিয়েটিক ইউনিট
- ফিজিওথেরাপি এবং রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার
- হসপিস সেন্টার
- বোনম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন সেন্টার
- লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশন সেন্টার
- কিডনি ট্রান্সপ্লান্টেশন সেন্টার
- অন্যান্য স্পেশালিটি ইউনিট
  - ইন্টারভেনশনাল রেডিওলজি ইউনিট
  - হেমাটো অনকোলজি ইউনিট
  - পেডিয়াট্রিক হেমাটো অনকোলজি ইউনিট
  - পেইন এন্ড প্যালিয়াটিভ কেয়ার ইউনিট
  - সাইকো অনকোলজি ইউনিট
  - ডায়েট এন্ড নিউট্রিশিয়ান ইউনিট

- ১৫০ বেড আইপিডি
- ৩০ বেড কেমোথেরাপি ডে-কেয়ার
- ২৪ ঘন্টা ইমার্জেন্সি
- আইসিইউ/ এইচডিইউ
- ৬ মডিউলার অপারেশন থিয়েটার ও রোবটিক সার্জারি ইউনিট
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন ল্যাবরেটরি
  - হিস্টোপ্যাথলজি ও সাইটোপ্যাথলজি
  - ইমিউনোহিস্টোকেমিস্ট্রি
  - ফ্লোসাইটোমেট্রি
  - মলিক্যুলার ল্যাব
  - নেক্সট জেনারেশন সিকোয়েন্সিং (NGS)
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন রেডিওলজি ইউনিট
  - PET সিটি স্ক্যান
  - এম.আর.আই (3T)
  - সিটি স্ক্যান
  - আলট্রাসনোগ্রাফি (4D)
  - ম্যামোগ্রাফি (3D)
  - টিউমার এবলেশন সেন্টার

২৪ ঘন্টাই যেকোনো স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে আমরা আছি আপনার পাশে

26 Green Road, Dhanmondi, Dhaka-1205
Web: www.labaidcancer.com fb.com/labaidcancerhospital
Email: info@labaidcancer.com
Youtube: /labaidcancerhospital
Linkedin: /company/labaid-cancer-hospital

HOTLINE
10664